চীনের রূপকথা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মূল্য দুই টাকা

সূচীপত্র

সে অনেক—অনেক কাল আগে—এত কাল আগে যে, এটিকে সত্যি গল্প না বলে কেউ কেউ বলবে রূপকথা,—অনেক দূরে শান্‌সির এক পাহাড়ীয়া নগরে থাকতো একটি ছোট মেয়ে। তার নাম ছিল পীচফুল। তার মা-বাবা তাকে কেন যে এই সুন্দর নামটি দিয়েছিলেন তা জানি না, তবে এটা ঠিক যে, তার চেয়ে তাঁরা তার ভাইদের ভালোবাসতেন ঢের বেশি। ক্ষিদে পেলে তারা খেতে পেতো সবচেয়ে ভালো খাবার, খেলবার ইচ্ছে হলে খেলতে পেতো একেবারে নতুন খেলনা। তাই দেখে পীচফুল কতদিন কাঁদতো!

সে যদি সে-সবের আবদার ধরতো তা'হলে তার বাবা তাকে ক্ষেপাবার জন্যে বলতেন, "শাস্ত্রে কি লেখা নেই যে, পুরোনো টালি-ভাঙার একটু টুকরোই মেয়েদের খেলনা হবার পক্ষে যথেষ্ট?"

তাই শুনে পীচফুলের ছোট বুকখানি কান্নায় ভরে উঠতো। সে কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতো। কারণ, চীনদেশের নিয়ম এই ছিল যে, কোন মেয়েকে যখন গুরুজনেরা বকবেন, তখন সে কিছুতেই তাঁদের কথার জবাব দিতে পারবে না।

তবে পীচফুলের বাবা তাকে স্নেহ করতেন। তিনি যে

তাকে কতখানি ভালোবাসতেন তা সে বুঝতেই পারতো না। তিনি কেবল একটা পুরোনো নিয়ম মেনে চলতেন বলে তাকে বলতেন, "তুই মেয়ে।" কিন্তু তিনি অন্তরে অন্তরে জানতেন, তাঁর সন্তানগুলোর মধ্যে সে ছিল প্রত্যেকের চেয়ে সুন্দর। কিন্তু হায়! তাকেও একদিন কনে সাজিয়ে, রাঙা দোলায় চড়িয়ে পাঠাতে হবে পরের ঘরে। তাই, যে পরের ঘরে চলে যাবে, তার জন্যে খরচ করতে তাঁর মন চাইতো না।

কিন্তু বেচারী পীচফুল এ সব বুঝতো না। কতদিন রাতের বেলা কাঁদতে কাঁদতে সে ঘুমিয়ে পড়তো। শেষে এক রাতে তার ঠাকুমা তার ফোঁপানি শুনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার বিছানাটির কাছে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে স্নেহমাখা স্বরে চুপি চুপি বললেন, "তোমার কি হয়েচে দিদি আমি জানি। আমিও যখন তোমার মতো ছোট ছিলাম, বাড়ির সবাই কতদিন আমাকে এমন সব কথা বলেচে যা শুনে মনে বড় কষ্ট হতো। সব-কিছুর চেয়ে এই কথাই বেশি শুনতাম, ভাইয়েদের সঙ্গে সমান জেদ করো না, তাদের আবদার শুনতেই হবে। আমিও সেইমতো চলতাম। কারণ আমি মেয়ে। একদিন আমার দাদা আমার পুতুলটি হাত থেকে কেড়ে নিলেন। পুতুলটিকে আমি খুব ভালোবাসতাম। তারপর মাথার উপর ঘুরিয়ে সেটিকে ছুড়ে দিলেন ছাদে। আমি তাঁকে 'দস্যি ছেলে' বলে সজোরে মারলাম এক চড়। তাতে রেগে উঠে তিনিও আমাকে মারলেন। মা দেখলেন, আমরা দুজনে

ঝগড়া করচি। তাতে তিনি কি করলেন জান? তিনি কি আমাদের ছুজনকেই মেরে রাতের বেলা না খাইয়ে রাখলেন? তা নয়। তাঁর আদরের ছেলেটির গায়ে আমার হাত দেবার স্পর্ধা হয়েছিল বলে আমাকে দিলেন শাস্তি। আর, ছুলালটিকে একটি কড়া কথাও বললেন না। দিদি, এই হলো আমাদের চীনদেশের রীতি। আমরা নিরুপায়! ছুঃখ করে লাভ নেই। এদেশের যত মেয়ে আর বয়স্কারা আছেন, তাঁদের সকলের চোখের জলেও একটা নিয়মকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।”

কথাগুলো বলতে বলতে বুড়ী-ঠাকুমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, আর পীচফুল ঠাকুমার স্নেহমাখা, কোঁচকানো মুখখানির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

“এখন ঘুমোও সোনামানিক আমার, ঘুমিয়ে পড়। পাথরের দেওয়ালে মাথা কুটে কি হবে? কিন্তু মনে রেখো, যাই ঘটুক, তোমার বুড়ী-ঠাকুমাই সব সময়ে তোমার সত্যিকারের বন্ধু হয়ে থাকবে, তোমার ছুঃখে চোখের জল ফেলবে।”

পীচফুল পাথরের দেওয়ালের ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারলো না সত্যি, তবু তার বুড়ী-ঠাকুমাটির মিষ্টি কথায় বড় খুশি হলো। তার মনও হলো কিছু শান্ত।

অবশ্য সেকালে সেই ফুলের রাজ্যে ইস্কুল-পাঠশালা ছিলই না। পীচফুলও তাই লিখতে-পড়তে জানতো না। কিন্তু সে তার মায়ের কাছে শিখেছিল রান্নাবান্না, আর ঠাকুমা তাকে শিখিয়েছিলেন সেলাই আর কারুকায। সে যেতো তার

বৌদির সঙ্গে কাছের ছোট পাহাড়ীয়া নদীটিতে কাপড় কাচতে। সেখানে গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা আসতো রোজই। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি জমতো মেয়েদের ভিড়। পাথরের পাটে ময়লা কাপড়-চোপড় ঘষতে ঘষতে, আছড়াতে আছড়াতে তারা অবিরাম গল্প করতো। তাদের কথাবার্তা শুনতে পীচফুলের মজা লাগতো। কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে ভাবতো, অনবরত কথা বলতে বলতে তাদের মুখ ব্যথা করে না কি!

আরও অনেক ছোট মেয়ে তাদের মা. ও দিদিদের সঙ্গে যেতো সেই নদীটির ঘাটে। কাজেই অন্য জায়গার চেয়ে সেখানেই পীচফুলের হাসিখেলার সুযোগ ছিল বেশি। তার সাথীদের চেয়ে তারই বুদ্ধি বেশি ছিল বলে সেই হতো খেলায় তাদের সর্দার। সে তাদের শিখাতো কি করে অস্ত্র ধরতে হয়, যাঁতা ঘোরাতে ঘোরাতে বলতে হয় কি, কেমন করে খেলাগুলো হয় খেলতে। কখন কখন সে নিজেও নতুন খেলা তৈরী করতো।

একদিন সে ছোট ছোট মেয়েদের শিখালে কেমন করে সৈন্যদের মতো কচু-কাওয়াজ করতে করতে চলতে হয়। সে দেখেছিল তার ভাইয়েদের তেমনি করে চলতে।

সে তাদের কাছে গম্ভীর ভাবে বললে, "আমার ঠাকুমা বলেচেন, শয়তান ডাকাতগুলোর হাতে আমাদের মেয়েদের একদিন বিপদে পড়তে হবে, তাই সৈন্যদের মতো আমাদেরও কুচ-কাওয়াজ করতে শেখা দরকার।"

একদিন তাকে তার ক্ষুদে সাথীদের কাছে উত্তর-অঞ্চলের দুর্ধর্ষ শত্রুগণের গল্প বলতে শুনে তার বাবা খুব হাসলেন।

কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। কারণ তিনি খুব ভালো করেই জানতেন যে, লক্ষ লক্ষ নিষ্ঠুর তাতার-দস্যু সারা চীনদেশ ছারখার করে বেড়াচ্চে। তারা যে-কোন দিন তাদের ক্ষিপ্রগামী ঘোড়াগুলোয় চড়ে লুঠ-তরাজ করতে সেদিকেও আসতে পারে। তিনি জানতেন, তাঁদের শহরের শান্তিপ্রিয় লোকগুলো সেই বন্য যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াইয়ে কিছুতেই পারবে না। কারণ ওরা অস্ত্রচালনা শৈশব থেকেই শেখে।

সে রাতে পীচফুলকে তার বাবা কোলে বসিয়ে খুব আদর করলেন, আর, গল্প বললেন সেই যাযাবরদের। বললেন, তারা সারা জীবন ঘোড়ায় চড়েই কাটায়। যখন ছোট্ট থাকে, তখন তাদের শিখানো হয় ভেড়ার পিঠে চড়ে ছোট ছোট তীর-ধনুক দিয়ে পাখি শিকার করতে।

পীচফুল অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে, “আচ্ছা বাবা, তাদের দেশে শহর নেই? তাদের বাড়িঘরও নেই কি? তারা লেখাপড়াও জানে না?”

তার বাবা জবাব দিলেন, “তারা খাওয়া, ঘুমোনো, ঘোড়ায় চড়া, চুরি আর খুন ছাড়া অন্য কিছু জানে না। তারা বাজপাখির মতো মুরগীর ছানা খুঁজে বেড়ায়। ছোঁ দিয়ে পড়ে মানুষকে মেরে ফেলে। তারা হচ্চে আমাদের বড় শত্রু। তাদের দেখলে, আমাদের গাঁয়ের লোকেরা ভয়ে ভেড়ার পালের মতো ছুটে পালায়।”

পীচফুল তাঁর কথাগুলো ঠিকমতো বুঝতে পারলে না; জিগ্যেস করলে, “কিন্তু কেন? আমি বুঝতেই পারচি না কেন

আমরা পালাই ? আমাদের সৈন্যেরা কি তাদের সঙ্গে লড়াই করে আমাদের শহরগুলোকে রক্ষা করতে পারে না ?”

—“উট কি বাঘের সঙ্গে পারে বাছা ?”

তার বাবার কথাগুলো শুনে পীচফুল ভাবতে ভাবতে শুতে গেল। চীনারা কেন বিদেশী দস্যুদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে না ? সে নিজের মনে বললে, “আমি যদি বড় হতাম, তা'হলে এই শয়তানগুলোকে একটুও ভয় করতাম না।” বলতে বলতে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর—

অনেক বছর কেটে গেল। পীচফুলের বয়স তখন পনেরো বছর। তার স্বাস্থ্য চমৎকার, গায়েও বেশ জোর, মনে স্ফুর্তি ও তেজ। একদিন রাতে সে তার শক্ত বিছানাটিতে শুয়ে আছে, ঘুম তখনও আসেনি, তার বাবার কয়েকটি কথা কানে গেল। কথাগুলো শুনে সে ভয়ে আর ঘুমোতে পারলে না। তিনি বলছিলেন, “আমাদের মেয়েটির বিয়ের বয়স হয়েচে। এখন আর ওকে খাইয়ে-পরিয়ে রাখবার শক্তি আমার নেই। তবে মেয়েটা ছিল ভালো। শীতকালে তেমন তুষার পড়েনি বলে এবছর আমাদের ফসল খুব খারাপ হয়েচে। আসচে শীতে আমাদের দিন চালানো হবে কঠিন। মেয়েটার জন্যে একটি বর ঠিক করতেই হবে। মোট কথা যে পরের সম্পত্তি হবে তার জন্যে আমাদের টাকাকড়ি খরচের দরকার কি ?”

তারপর পীচফুল শুনতে পেলো, তাঁরা ঘটকীকে খবর দেবার কথা বলচেন। ভয়ে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। সে তাদের বাড়ি ছেড়ে, বিশেষ করে স্নেহময়ী ঠাকুমাকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে চায় না। আচ্ছা, মা-বাবা কি সত্যই তাকে বিদায় করতে চান ? সে তো এখনও ছেলেমানুষ। তবুও কেন তাঁরা তার বিয়ে দেবার জন্য এত ব্যস্ত ? হায় রে ! এর আগে তো কোনদিন তাদের বাড়ি তার কাছে এত ভালো লাগেনি।

পরদিন সকালে পীচফুল তার বাবাকে মিনতি করে বললে, তার বিয়েটা আরও বছরখানেক পিছিয়ে দিতে। কিন্তু তিনি বললেন, তাকে ছাড়তে তাঁর কষ্ট হবে বটে, তবুও উপায় নেই। এবার ফসল হয়েচে এত কম যে, সংসারের সবাইকে খাওয়াবার মতো তাঁর টাকার বড় অভাব।

পীচফুলের চোখ ফেটে জল পড়তে লাগলো। বুড়ী-ঠাকুমা তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তা মিছে হলো। হতভাগিনীর মন লোহার পাহাড়ের মতো ভারী হয়ে উঠলো।

তারপর কথাবার্তায়, খোঁজখবরে অনেক সপ্তাহ গেল কেটে। বর আর ঠিক হয় না। ঘটকী অনেকবার যাওয়া-আসা করলো। পীচফুলের মা-বাবার সঙ্গে তার খুব তর্ক-বিতর্ক হলো। প্রথম সম্বন্ধের সঙ্গে তাঁরা মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হলেন না। কারণ ছেলেটি বড় অলস, বাড়ি বসে থাকে। দ্বিতীয় সম্বন্ধ তাঁরা ফেরৎ দিলেন। কারণ শাশুড়ী মানে বরটির মা ভারী নিষ্ঠুর আর কুঁদুলে। পীচফুলকে সে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারবে। তৃতীয়টির লগ্ন-দোষ ছিল। তার সঙ্গে

পীচফুলের ঠিকুজি মিললো না। বিয়ে দিলে কনে অসুখী হবে। তাই সেটিও বাতিল হলো। তারপর এলো চতুর্থ সম্বন্ধ। ছেলেটির বয়স সতেরো বছর, সব দিক দিয়ে যোগ্য পাত্র। কিন্তু যেদিন তার সঙ্গে বিয়ের পত্র লেখা হবে, ঠিক সেই দিনই এলো এক সাংঘাতিক খবর। সে খবর সারা শহরে জাগালো উত্তেজনা। তাতার-দস্যুদের হাত থেকে কি করে প্রাণ বাঁচানো যায়, সেই চিন্তায় লোকে সব-কিছু গেল ভুলে। খবর এসেছিল, তারা আসচে ঘোড়ায় চড়ে হাজারে হাজারে।

সকলে ভয়ে পাগল হয়ে উঠলো। তারা চীৎকার করে বলতে লাগলো, "তাতাররা আসচে! তাতাররা আসচে! আমাদের একটিও সৈন্য নেই; লড়বার মতো হাতিয়ারও আছে সামান্য। তাদের সামনে আমরা বাতাসে পোকার মতো যাবো উড়ে। তারা এসে আমাদের খাবার, কাপড়-চোপড় লুঠে নিয়ে যাবে, ধরে নিয়ে যাবে আমাদের মেয়েদের, আমাদের শিশুদের মেরে-কেটে শেষ করবে। কি করবো? আমরা করবো কি?"

পরিবারের সকলকে বাঁচাবার জন্যে কি করা যেতে পারে, সে বিষয়ে পরামর্শ করতে পুরুষরা সব এক জায়গায় জমায়েৎ হলো। একজন মোড়ল বললে, "দস্যুদের যদি অনেক টাকা দেওয়া যায়, তা'হলে হয়তো তাদের লোভ মিটবে, তারা আর কোন গণ্ডগোল না করে চলে যাবে।" অন্য মোড়লরা মাথা নাড়লে; বললে, "না না, তা কি হয়? তা'হলে তারা আরও পেয়ে বসবে। বলবে—আরও নিয়ে এস। এক গাল খেলেই

কি ক্ষিদেটা বাড়ে না? তখন কি লোকের আরও খেতে ইচ্ছে হয় না? এখন একটি মাত্র কাজ করা যেতে পারে। চল, সকলে নিজের নিজের জিনিস-পত্র সব নিয়ে আজ রাতে পাহাড়ে পালিয়ে যাই। আমরা তো সেখানকার

সব লুকোনোর জায়গাগুলো জানি। এই বিদেশী শয়তানেরা সেখানে যেতে সাহস করবে না। তারা এসে যখন দেখবে শহর একদম খালি, এখানে ধন-দৌলৎ কিছুই নেই, তখন যাবে পরের শহরে।”

সকলে সে কথাই মেনে নিল। পীচফুলের বাবা ছুটতে ছুটতে বাড়ি গিয়ে সকলকে বললেন, শিগগিরই তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে পাহাড়ে পালাতে হবে। দেখতে দেখতে

সারা বাড়িতে শুরু হলো গোলমাল। বাবা, মা, ঠাকুমা, ছেলে-মেয়েরা, চাকর-চাকরাণী সব একসঙ্গে পালাবার জন্যে জিনিস-পত্র বাধা-ছাঁদা করতে লাগলো। প্রত্যেকে—তা সে যত ছোটই হোক্—হয়ে উঠলো কাজের লোক। পীচফুল ছাড়া সকলেই বিষণ্ণ। মনে মনে ভারী খুশি হয়ে উঠেছিল সে। কারণ এর ফলে তার বিয়ের আয়োজন বন্ধ। সকলকে ছেড়ে একটি অচেনা লোকের সঙ্গে চলে যাওয়ার চেয়ে তার প্রিয়জনদের সঙ্গে এক অন্ধকার ঠাণ্ডা গুহায় আশ্রয় নেওয়া যে অনেক ভালো।

সারা শহরে লোকেরা এধারে-ওধারে ছুটোছুটি করছিল। সব চেয়ে দরকারী জিনিসগুলো হচ্ছে খাবার, কাপড়-চোপড় আর বিছানা। গাধার পিঠে চড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে বড় বড় বোঁচকা আর বাক্স বাঁধা হয়েছিল। যাদের গাধা বা অশ্বতর ছিল না, তারা লম্বা ডাণ্ডা বা বাঁশের মাথায় বোঁচকা ঝুলিয়ে ঘাড়ে নিয়ে চললো। যাদের বোঝা হলো ভারী আর বড়, তারা দুজনে বাঁশ কাঁধাকাঁধি করে নিল। শূয়োর আর মুরগীর পাল এক জায়গায় জড় করা হলো। সেগুলোও লোকদের সঙ্গে যাবে। ঠিক হলো, যাত্রা করতে হবে বেলা তিনটে। শহরের সব লোক যাবে একসঙ্গে।

কিন্তু শহরবাসীদের কপাল মন্দ। নিষ্ঠুর তাতার-দল যতদূরে আছে তারা মনে করেছিল, তারা এসে পড়েছিল তার চেয়েও অনেক কাছে। যাই হোক, শহর ছেড়ে যাবার সব ঠিক। রওনা হতে আর মোটে আধ ঘণ্টা বাকি,

এমন সময় একজন গ্রামবাসী শহরের উঁচু পাঁচীলের গায়ে উত্তরের প্রকাণ্ড ফটকের মধ্য দিয়ে পাগলের মতো ছুটে আসতে আসতে চীৎকার করে বলতে লাগলো, "তোমরা খুব দেরি করে ফেলেচো। ডাকাতগুলো এসে পড়েচে। তাদের দেখা যাচ্চে।

এখন ফটকগুলো বন্ধ করে মন্দিরে ধুপ-ধুনো পুড়িয়ে দেবতাদের ডাক, যেন তাঁরা তোমাদের রক্ষা করেন।"

কথাগুলো বড় সত্যি। আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করা যায় না। উত্তর-দিকের পাঁচীল থেকে দূরে মাঠের ওপর ধুলোর মেঘ উড়তে দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট। তার একটু পরেই দেখা গেল রঙিন ঝলমলে নিশান রোদে আগুনের মতো জ্বলচে। ওই তারা আসচে হাজারে হাজারে যেন বন্যা। তারই শব্দ হচ্চে। ধুম-ধুম, ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দে শহরের

চারটি প্রকাণ্ড ফটক বন্ধ হয়ে গেল। তাতে লাগানো হলো বড় বড় মজবুত খিল। সে দরজা ভাঙতেও ওদের অন্তত কিছু সময় লাগবে।

পাঁচীলের এধারে সবাই ভয়ে, উত্তেজনায় পাগলের মতো হয়ে উঠেচে। কি করে তারা এই নিষ্ঠুর দস্যুদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবে? তাদের মধ্যে যে কারোই যুদ্ধে অভিজ্ঞতা নেই। তারা সকলেই সরল, শান্তিপ্রিয় লোক। কোন্‌টাকে বল্লম বলে, আর কোন্‌টাকে বলে তীর, তা তারা এক রকম জানেই না। তৎক্ষণাৎ শাসনকর্তাদের সভা বসলো। তারা প্রত্যেকেই মনে করলো, তাদের মধ্যে সব চেয়ে বুদ্ধিমান আর বিজ্ঞ যদি কেউ থাকে, তা'হলে সে হয়তো এই সর্বনাশা বিপদ কাটিয়ে উঠবার কোন উপায় দেখিয়ে দিতে পারবে।

পীচফুলও অবশ্য আর সকলের মতোই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তার বুড়ী-ঠাকুমা তাকে প্রায়ই তাতারগুলোর ভীষণ গল্প বলতেন। বলতেন, অনেক বছর আগে তারা কেমন করে শহরে-শহরে, শান্‌সির উঁচু পাঁচীল-ঘেরা শহরে শহরে, লুঠ-তরাজ করতো। তাদের শক্তি ছিল এমন ভীষণ যে, চীনের উত্তরদিকের বিখ্যাত পাঁচীলটাও তাদের বাধা দিতে পারতো না। ঠাকুমা গল্পগুলো এই বলে শেষ করতেন, "তোমার এখন দেবতাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, পীচফুল। কারণ সে-সব দিন আর নেই। তুমি এখন শান্তির রাজ্যে বাস করচো। অশান্তির কাল কেটে গেচে। ছেলেবেলায় আমরা

সদাই বড় ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতাম, এই ভেবে যে কোন্ দিন সেই বর্বরগুলো এসে আমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়েই করে বা!"

তার উত্তরে পীচফুল বলেচে, "ঠিক কথা। কিন্তু তারা ঘোড়ায় চড়ে কি রকম মজা করে চারধারে ছুটে বেড়ায়। দেখ ঠাকুমা, তারা যদি তোমাকে ধরেই নিয়ে যেত, তা'হলে আমি চীনে মেয়ে না হয়ে হতাম ছোট্ট তাতার মেয়ে। হতাম না, ঠাকুমা?"

সে-কথা শুনে তার বুড়ী-ঠাকুমা খুব হাসতেন আর পীচফুলের রাঙা গালে সস্নেহে চড় মারতেন আর বলতেন "ঠিক বলেচো। তোমাকে সেই উত্তুরে শয়তানগুলোর মেয়েদের মতো চটকদারী পোশাকে দেখাতোও খাশা!"

কিন্তু এখন সব-কিছু বদলে গেচে। এখন আর ঠাকুমার মুখের গল্প নয়। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু। সেই ভীষণ যোদ্ধারা এসে পড়েচে একেবারে শহর-ফটকের বাইরে। অনেক বছর আগে তার ঠাকুমা যে বিপদে পড়েছিলেন, আজ পীচফুল পড়েচে ঠিক সেই বিপদে। এ হলো তার ক্ষুদ্র জীবনে একটা মস্ত ব্যাপার, যেন দুঃসাহসিক কাজের একটি দিন এসে পড়েচে। সে যদি আর সবাইয়ের মতো হতো তা'হলে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে লুকোতো। কিন্তু পীচফুল পালালো না।

ঠাকুমা তাকে যে-সব গল্প বলেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে লিউচিংটিংয়ের গল্পের মতো আর কোনটিকেই সে ভালোবাসতো

না। লিউচিংটিং ছিল ষোলো বছরের এক তাতার মেয়ে। সে হয়েছিল এক যুদ্ধে সেনানেত্রী। তার অধীনে যুদ্ধ করেছিল হাজার হাজার তাতার সৈন্য। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তাকে যে পুরুষ পরাস্ত করতে না পারবে, তাকে সে বিয়ে করবে না। তার এই কথাতেই না যে বীর সেনাপতি তাকে বন্দী করতে এসেছিল, তার হাতে সে বন্দী হয়েছিল? সেই মেয়েটিকেই করা হয়েছিল চীনা সৈন্যদের নেত্রী। সে ত্রিশ বছর ধরে সেই সৈন্যদের যুদ্ধে পরিচালনা করে জয়ী হয়। সেই মেয়েটি কি চীনা বীরাঙ্গনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল না? চীনা-চাষীরা কি নববর্ষের উৎসবের দিনে তার ছবির সামনে দণ্ডবৎ করে না? সেই ছবিতে আছে, মেয়েটি বিরাট বাহিনী নিয়ে ইয়াংচৌয়ের বিশাল ফটক আক্রমণ করেচে! হচ্চে তুমুল যুদ্ধ!

তাই সেদিন বিপদের কথা শোনামাত্র পীচফুলের মনের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের মতো খেলে গেল এই কথাগুলো, "আমি যদি লিউচিংটিংয়ের মতো হতাম, তা'হলে হয়তো শহরটাকে বাঁচাতে পারতাম। এমন কিছু নেই কি, আমি মেয়ে হয়ে যা করতে পারি? ওরা বরাবরই বলেচে আমি মেয়ে। ওরা আমার ভাইদেরই সবচেয়ে ভালো জিনিস দিয়ে এসেচে। এখন আবার একটা ছেলের হাতে আমাকে একেবারে দিয়ে দিতে চায় যাকে আমি কখন দেখি নি। আমায় গিয়ে পড়তে হবে পরের ঘরে। ওদের বলেচি, আমি যেতে চাই না; তবুও ওরা আমার কথায় কান দেয় নি। আমি যেন শূয়োর বা ছাগল এমনিভাবে

আমাকে বিদায় করতে চায়। আমি ওদের দেখাবো চীনে মেয়ে আর চীনে ছেলের দামের তফাৎ নেই। চীনে মেয়েও সাহসী হতে পারে, বিপদের সময় ছেলেদের মতোই হয়ে উঠতে পারে কাজের !”

এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে পীচফুলের কালো চোখ দুটি বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠলো। সে মনে মনে ঠিক করলো, লিউচিংটিংয়ের মতো হবার কোন সুযোগ যদি সে পায়, তা'হলে কিছুতেই তা ছাড়বে না। এই সেরা রাজ্যের মেয়েদের কেন বলা হবে দুর্বল, অসহায় ? এক সাহসী মেয়ে তার দেশের জন্যে কি যে করতে পারে তা সে দেখাবে।

ইতিমধ্যে তাতার-সর্দার তার বাহিনী নিয়ে নগরের কাছে এসে পড়েছিল। তার সহকারীদের বললে, “ওখানে অনেক লুটের মাল আছে। আমার বাবা ওখানে বহু বছর আগে এসেছিলেন। তাতে তিনি খুশিই হয়েছিলেন।”

—“ওরা কি খুব লড়বে বলে মনে হয় ?”

—“না ; নেকড়ে দেখলে ওরা ভেড়ার মতো পালাবে, দেখে নিও। ওরা, ওদের সকলেই, আমাদের উত্তরের যাযাবরদের নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপে। ওরা বড় জোর শহরের ফটক চারটে বন্ধ করে দেবে। তারপর ভগবান যা করেন সেই ভরসায় থাকবে। কয়েক ঘণ্টা দেরি হবে। তারপরই ওদের মরচে-ধরা ফটকগুলো আমরা ভেঙ্গে ফেলবো। কাল রাতের আগেই দেখবে আমরা ওদের মদের ভিস্তিগুলো

সাবাড় করে ওদের সব চেয়ে সুন্দরী মেয়েগুলোকে ধরে নিয়ে যাচ্চি বিয়ে করবার জন্যে।"

সর্দারের কথা শুনে সহকারীরা হো-হো করে হেসে উঠলো।

তারপর তখন প্রায় রাত হয়েচে, তারা এসে পৌঁছলো শহরের বাইরে। পৌঁছে দেখলে, ফটকগুলো বন্ধ। তারা খুব সাবধানে পাঁচীলের কাছে এলো। কিন্তু দেখলে কেউ বাধা দিল না। তাতে সাহস পেয়ে আরও কয়েক শো গজ কাছে সরে এলো। এইখানেই তারা পেলো প্রথম ধাক্কা। সর্দার যা দেখবে মনে করেছিল, তার বদলে দেখলো ফটকগুলো অনেক নতুন। তার ফলে, সে-রাতে ঢোকবার মতলব ছেড়ে দিল, ঠিক করলে পরদিন শহরে ঢুকবে।

সে বেশ স্ফুর্তির সঙ্গে বললে; "শোন জোয়ানরা, আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে বলে তোমরা মুখ ভার করলে কেন ? কাল মাসের পনেরো তারিখ নয় কি ? এই তারিখেই তো খুব ধুমধাম করে মন্দিরে পূজো দেবার দিন। তখন মহা উৎসবও হবে। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক। কাল শহরে ঢোকা যাবে। আজ রাতে কাজটা করা অসম্ভব।"

পরদিন সকাল হলো। সর্দারের সৈন্যেরা প্রকাণ্ড আর খুব মোটা কুঁদো দিয়ে লোহার ফটকে ঘা দিতে শুরু করলে। তাতে এমন প্রচণ্ড শব্দ উঠতে লাগলো যে, সারা শহরে তা শোনা যেতে লাগলো। মাঝে মাঝে তাদের মাথার ওপর

থেকে হতে লাগলো পাথরবৃষ্টি। সেজন্য বাধা ঘটতে লাগলো। তবে তাতে গা-হাত-পা একটু-আধটু কেটে-কুটে যাওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি হলো না।

তারা চীৎকার করে উঠলো, "আরে মৌমাছিগুলোকে কামড়াতে দাও! শীগ্‌গিরই আমরা ওদের সব মধু লুটে নেব।

ওরা যখন আমাদের প্রথম আক্রমণ করেচে, তখন আমরা ওদের কোন রকম দয়া দেখাবো না।"

কিন্তু নূতন ফটকগুলো অনবরত ঘা খেয়ে জখম হলেও খুললো না।

সর্দার হেঁকে উঠলো, "আর একটা রাত আমাদের বাইরে কাটাতে হবে জোয়ানরা। তোমরা হচ্চ আমার নেকড়ের

পাল। চারটে ফটকের ওপরই নজর রাখো যাতে একজনও না পালায়।”

তখন শরৎকাল। পূর্ণিমা রাত। আতঙ্কভরা স্তব্ধ শহরের ওপর সুন্দর চাঁদখানি হাসচে। তাতাররা তাঁবু ফেলেছিল পাঁচীলের কাছ থেকে কয়েক শো গজ দূরে। পাহারা দিচ্ছিল মাত্র কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী। আর সকলে খাচ্ছিল, গাল-গল্প করছিল, গান গাইছিল, শিষ দিচ্ছিল, শুয়ে শুয়ে ঠাট্টা-ইয়ারকি চালাচ্ছিল! বলছিল, কাল সকালে তারা শহরে কি রকম সহজেই ঢুকে পড়বে।

এমন সময় হঠাৎ যেন মায়ামন্ত্রে পাঁচীলের ওপর শূন্যে ভেসে এলো স্বচ্ছ পোশাক-পরা বিশ-ত্রিশটি মেয়ে। মনে হতে লাগলো, চাঁদের আলোয় এখানে-সেখানে ভাসচে কতকগুলো অতিকায় প্রজাপতি। তাদের আনন্দময়, হাল্‌কা হাসি মাঠের ওপর ভেসে বেড়াতে লাগলো স্বর্গীয় সঙ্গীতের মতো। তারা গাইতে লাগলো গান। তেমন মিষ্টি গান রুক্ষ তাতার যোদ্ধারা কোনদিন, কোনখানে শোনে নি। কোমল রুপালি আলোয় শূন্যে তারা নাচতে লাগলো ঘুরে ঘুরে। তাই দেখে তাতাররা এমন মুগ্ধ হয়ে গেল যে, সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো, “পরীর ঝাঁক! পরীর ঝাঁক! দেখ! সুন্দর পরীর ঝাঁক এসেচে!”

সৈন্যেরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে লাগলো। তারা ছেলেবেলা থেকে যার গল্প শুনে আসছিল চোখের সামনে দেখতে লাগলো তাই। তৃষাতুরের মতো

শুনতে লাগলো সুমিষ্ট স্বর্গীয় সঙ্গীত-ধারা আর আকুল মনে ভাবতে লাগলো, এই মনোরম ছবিখানি তাদের চোখের সামনে

কতক্ষণ ভেসে থাকবে। যে সৈন্যগুলো শহরের ফটক চারটি পাহারা দিচ্ছিল, তারাও সর্দারের হুকুম গেল ভুলে। পরীদের কথা কি করে যেন তাদের কানে গিয়েছিল। যেখান থেকে পরীদের নাচ দেখা যাচ্ছিল ফটক ফেলে তারা সেখানে এলো ছুটে।

হঠাৎ একজন গভীর হতাশায় করুণ কণ্ঠে বলে উঠলো, "হায়! হায়! ঐ দেখ, ওরা মিলিয়ে যাচ্চে! সুন্দরী পরীরা যাচ্চে মিলিয়ে!"

কথাগুলো খুবই সত্যি। তাদের মুগ্ধদৃষ্টির সামনে থেকে জ্যোৎস্নার মায়াকুমারীরা তখন মিলিয়ে যাচ্ছিল ছায়ায়। তারপর তাদের চোখের সামনে রইলো কেবল উজ্জ্বল সুন্দর জ্যোৎস্নামাখা পাঁচীল। তার ওপর কিছু নেই। শূন্য!

তারপরই একজন তাতার চীৎকার করে বলে উঠলো, "দেখ, দেখ, শহরের ফটকটা খোলা।"

সকলেই দেখলো, যে লোহার দরজা তারা প্রচণ্ড ঘা দিয়ে অনবরত চেষ্টা করেও কিছুতেই ভাঙতে পারে নি, তা সত্যিই খোলা রয়েচে। কেবল সেটাই নয়, শহরের বাকী ফটক তিনটিও তেমনি খোলা পড়েছিল। ব্যাপারটা যে কি হয়েচে তাতাররা তখন বুঝতে পারলে। তারা রাগে চীৎকার করে উঠলো, "ওরা আমাদের ঠকিয়েচে।"

—"চল, ভেতরে ঢুকে দেখা যাক এই হেঁয়ালিটার গোড়ায় কি আছে?"

উত্তর অঞ্চলের সেই যোদ্ধারা শহরে ঢুকে দেখলে,

চারধার খাঁ-খাঁ করচে, কোথাও কেউ নেই। তারা রাগে পাগল হয়ে উঠে লোকের বাড়ি বাড়ি ঢুকে পড়তে লাগলো। কিন্তু দেখলে, সেগুলোও ভিখারীর ভিক্ষাপাত্রের মতো শূন্য। তারা দোকান-পসার ও মন্দির-দেউলের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকলো। সে-সবও শূন্য। কেবল তাই নয়, আরও কয়েকটি কারণে তাদের দুঃখ ও রাগ হলো খুব বেশি। দেখতে পেলে, শহরের মানুষ-জনের সঙ্গে মূল্যবান যা-কিছু তাও অদৃশ্য হয়েচে। এক টুকরো সোনা কি রুপো, একমুঠো চাল কি পরবার মতো একখানা কাপড় তারা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেলে না।

অবশেষে ফটকের কাছে চৌকিদারের ঘরে তারা এই দুর্ভাগ্যের কারণ জানতে পারলে। সেখানে দেখলে, এক অন্ধকার কোণে ধুলো, কালিঝুল ও মাকড়শার জালের মধ্যে গুটিসুটি দিয়ে বসে আছে জন কুড়ি মেয়ে। তাদের পরনে পরীর পোশাক। ভয়ে তারা কাঁপচে। আর, তাদের সঙ্গে রয়েচে জন কুড়ি বুড়ো। কি বললাম? কুড়িটি মেয়ে নয়, উনিশটি। একটি ছিল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। তার কালো চোখ দুটি দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছিল। তার মাথাটি ছিল সগর্বে উন্নত, তার মুখখানিতে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। সে পীচফুল, তাদের নেত্রী। সে লিউচিংটিংয়ের কথা মনে করে তার শৈশবের খেলার সাথীদের নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তুলে নিষ্ঠুর তাতারদের হাতে নিজেদের বলি দিতে এগিয়ে গিয়েছিল।

পরীর নাচটা তারই একটা ফন্দি। সে-ই তার বন্ধুদের পরিয়েছিল পরীর পোশাক। তার বুড়ো প্রতিবেশীদের রাজী করেছিল এই ফন্দিতে সাহায্য করতে। তারাও আপত্তি করেনি। কারণ জীবনে তাদের আর কিসের আশা? বুড়ো হয়েচে, কবে মরবে!

তারা ধরেছিল লম্বা লোহার ডাণ্ডাগুলো। ডাণ্ডাগুলোকে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না। এই ডাণ্ডাগুলোর মাথায় দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল কুড়িটি মেয়ে। তারা শূন্যে ঝুলছিল। তাইতে মনে হচ্ছিল, তারা বাতাসে ভাসচে। পীচলফু শহরবাসীদের বুঝিয়েছিল, এই দৃশ্য দেখে তাতাররা কিছুক্ষণ সব ভুলে যাবে, তাদের কর্তব্যেও অবহেলা ঘটবে। সেই সময়ের মধ্যে শহরের সকলে ফটক খুলে চুপি চুপি পাহাড়ের গুহায় পালিয়ে যেতে পারবে।

ফন্দিটা যাদুর মতো কাজ করেছিল। তার ফলে সকলেরই প্রাণ রক্ষা হলো। হলো না কেবল সেই মেয়েটির আর তার পরীর দলের।

ক্রুদ্ধ তাতার ঘোড়সওয়ারের দল তাদের বন্দী করে নিয়ে চললো তাদের দেশে। কিন্তু তারা অন্তরে অন্তরে মেয়েগুলোর বুদ্ধি ও সাহসের প্রশংসা করতে লাগলো; আর, মনে মনে বলতে লাগলো, "এমন মেয়ে বিয়ে করতে পারবো, এ আমাদের ভাগ্য। এরা হবে আমাদের সন্তানদের মা। এমন মায়ের যে সব ছেলে হবে, কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। কেউ না।"

আর সেই বুড়োদের যারা ডাণ্ডা ধরে পরীর নাচ দেখিয়েছিল, তাদের তারা খুব মার আর মন খুলে গালাগাল দিয়ে ছেড়ে দিলে।

এই পর্যন্তই পীচফুলের কথা আমরা জানি। তার মা-বাবা যে-বিয়ের সম্বন্ধ করছিলেন তা থেকে সে নিষ্কৃতি পেলো সত্যি, কিন্তু গিয়ে পড়লো যেন জলে কুমীরের মুখ থেকে ডাঙায় বাঘের মুখে। পাঠক-পাঠিকাগণ, তোমরাই বিচার করে বল, কোন্‌টা ভালো।

তোমাদের কারো যদি চীনের শান্‌সি প্রদেশে তাইমুসিয়েনে কি তার কাছাকাছি কোন শহরে নববর্ষে যাবার সৌভাগ্য হয়, তা'হলে এক মনোরম দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে যাবে। তখন পীচফুল আর তার ঊনিশজন সঙ্গিনীকে স্মরণ করে হয় নাচ, গান, অভিনয়। শহর যায় ফুলে ফুলে, আলোয় আলোয় ছেয়ে। রাতে পোড়ে বাজি। শহরের পথে পথে হরেক রকমের মুখ, হরেক রকমের পোশাক—রেশমী, মখমলি, লাল, নীল, সাদা, পুরোনো, নতুন। বাজনা বাজে বাঁশি ও তারের। আকাশে আলো, গান, হাসি যায় ছড়িয়ে। এই উৎসবটা হলো বসন্ত-আবাহন উৎসবের একটি অঙ্গ। সে কতকাল আগে এক রাতে পীচফুল উত্তরের হাজার হাজার দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর তাতার সৈন্যদের কৌশলে ভুলিয়ে তাদের শহর ও শহরবাসীদের প্রাণ রক্ষা করেছিল নিজের জীবন তুচ্ছ করে! তবুও লোকে আজও তার কথা ভুলতে পারে নি; তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে করে। উৎসবে চাঁদনী রাতে তেম্নি করে আজও হয় পরীর নাচ।

অনেক—অনেক কাল আগে, পীত নদীর ধারে একটি ছোট ছেলে থাকতো। তার নাম ছিল ইওটো।

তার বাবার একখানি সুন্দর ফলের বাগান ছিল। বাগানখানির নাম-ডাক ছিল খুব। তা থেকে তাদের সংসারটা চলে যেতো বেশ।

ইওটোর জন্মের আগে অবধি তার মা-বাবার মনে ভারী দুঃখ ছিল। তাঁদের দুঃখ ছিল যে, দেবতারা তাঁদের একটিও ছেলে দেননি। এজন্যে তাঁরা কত দুঃখ করতেন, গাঁয়ের মন্দিরে ধূপ-ধূনো জ্বালাতেন, বিগ্রহের কাছে পুজো দিতেন। আর বলতেন, "ঠাকুর, তোমাদের শাপ ফিরিয়ে নাও। ফিরিয়ে নাও।"

কিন্তু তাঁদের ঘরে ছিল পাঁচটি গোলাপ-রাঙা ছোট মেয়ে। তাদের রূপে ঘর ছিল আলো হয়ে। তবু তাঁরা খুশি ছিলেন না। তারা পাঁচটিতে যখন পর পর জন্মেছিল, তখন তাঁদের সংসারে দুঃখের ছায়াও পড়ছিল ক্রমেই বেশি করে। শেষে তাঁরা একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। পড়শীদের মতো তাঁরাও মনে করতেন, একটি ছেলে বারোটি মেয়ের সমান। কারণ প্রত্যেকটা মেয়ে কি সংসারের বোঝা নয়?

বড় হলেই তারা কি পরের ঘরে গিয়ে তাদের সংসারের কাজ-কর্ম করে দেবে না? আর, ছেলে বাড়িতেই থাকবে। মা-বাবা যতদিন বাঁচবে তাদের জন্য খাটবে ততদিন। তা'ছাড়া, সে আরও কত কাজে লাগবে।

ছেলের জন্যে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা এমন হলো যে, মা একদিন মন্দিরে গিয়ে সবায়ের সামনে মানৎ করলেন—দেবতারা যদি তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন, তা'হলে মন্দিরে যে বিগ্রহটি নষ্ট হয়ে যাচ্চে, সেটিকে সারাবার সব খরচ দেবেন তিনি।

দেবতাটি ওয়াঙ-গিন্নীর কথা শুনলেন কিনা তা বলতে পারি না, তবে এটা ঠিক যে, মাস কয়েকের মধ্যেই ইওটো এলো তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে। তার জন্মাবার এক বছর পরে তাঁরা একদিন খুব ঘটা করে তাঁর নামকরণ করলেন। সেদিন তাঁরা তাকে যে নাম দিয়েছিলেন আমরা তাকে ডাকবো সেই নামেই।

দিনটি এলো। এক ছেলে। তাই খুব ধুমধাম ও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়েচে। ঠাকুমা তাকে দিয়েচেন নতুন ঝলমলে, রঙ্‌চঙে পোশাক। তাকে পরানো হলো সেগুলো। তারপর তাকে বসানো হলো টেবিলে একটি বাঁশের ধুচুনির ওপর। তার হাতের কাছে রাখা হলো নানা রকমের জিনিস। সেগুলোর মধ্যে ছিল একখানি বই, একটি পেতলের আয়না, এক যোড়া নিক্তি, একটি টাকা, গোণবার যন্ত্র, একটি কলম, একখানি কালির চাবড়া, একখানি ছুরি, কতকগুলো সোনার গয়না আর অনেক রকমের ফল।

টেবিলের ধারে তার মা-বাবা দাঁড়িয়ে আগ্রহভরে

দেখতে লাগলেন, সে প্রথমেই কি নেয়। তাঁদের গর্ব ধরে না।

তার কাছে আরও যারা দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর ঠাকুমা, আত্মীয়-স্বজনেরা আর পাঁচটি বোন। সকলেই দেখচে সে প্রথমেই কি নিয়ে খেলা করে। সে যেটা প্রথমে ধরবে, সেটা থেকেই বোঝা যাবে, সে বড় হয়ে কি হবে। সে যদি বই বা কলম নেয়, তা'হলে হবে বড় পণ্ডিত; যদি টাকা গোণবার যন্ত্র, নিক্তি বা গয়না ধরে তা'হলে হবে পয়সাওয়ালা লোক; যদি ছুরি ধরে তা'হলে যোদ্ধা; আর, যদি ফল তুলে নেয় তা'হলে হবে চাষী।

ছেলেটি খেলনাগুলোর দিক থেকে তার চারধারে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য ক্ষুদে চোখ দুটি তুললো। মনে হলো, সে যেন বুঝতে পেরেচে, তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন সে কি করে তাই দেখতে। তারপরই সে মোটা ছোট হাত দুখানি বাড়িয়ে, সামনের দিকে ঝুঁকে তার কাছের সব জিনিসগুলোকে এক জায়গায় জড় করে ফেললে। তাতে মনে হলো, তার চোখের সামনে যা-কিছু আছে সে সব চায়।

নিমন্ত্রিতেরা সকলে এমন অদ্ভুত কাণ্ড দেখে 'হো হো' করে হেসে উঠলেন।

তার বাবা বললেন, "তা ইয়ো তো! ও সব চায়। ইয়ো তো মানে সব চাই। ওর নাম হবে তাই।"

সেদিন থেকে ক্ষুদে ওয়াঙের নাম হলো, সবচাই। তারপর থেকে তার কাজ-কর্ম দেখে তার মা-বাবা বুঝলেন, তার সেই নাম দিয়ে তাঁরা খুব বুদ্ধিমানের কাজই করেচেন। তার হাতের কাছে বা নাগালের বাইরে এমন কোন জিনিস ছিল

না যা সে না চাইতো। তার বোনেদের নিজের বলতে কিছুই ছিল না। ভাই যা চাইতো তারা যদি তা না দিত তা'হলে ছেলেটা এমন চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিত যে, জিনিসটা তাকে দিয়ে দিতে পারলে সে হতো খুশি।

বাগানের সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে রসালো, সব চেয়ে মিষ্টি ফলটা সে না চাইতেই পেতো। অসময়ে ফলশূন্য বাগানের দিকে ছোট হাত দু'খানি বাড়িয়ে সে ফলের আবদার ধরতো।

কাজেই সে লোভী শিশু থেকে হয়ে উঠলো স্বার্থপর বালক। তার মা-বাবাও সব সময়ে তার আবদার রাখতেন। তাঁরা যে তার একটা খারাপ অভ্যাস গড়ে তুলচেন, তা তাঁদের চোখেই পড়তো না। বাড়িতে যেদিন ভালো রান্না হতো না, ভালো খাবার তেমন কিছু থাকতো না, তার বোনেরা ক্ষিদেয় কাঁদতো সবচাই সেদিন এত খাবার পেতো যে চারধারে তা ছড়াতো। যা পড়ে থাকতো বোনেরা যদি সাহস করে তা চাইতো তা'হলে সে উত্তর দিত, "পাবে না, তোমরা মেয়ে।"

সবচাই গ্রামের পাঠশালায় পড়তে গেল। কিন্তু সেখানে তেমন সুবিধা করতে পারলে না। তার খেলার সাথীরা তাকে খাতির করলে না। তাতে তার মনে বড় কষ্ট হলো। খেলার সময়ে তারা রঙ্‌চঙে ঘুড়ি ওড়াতো, সে-সব নেবার জন্য সব-চাইয়ের ভারী লোভ হতো। তারা তাকে ঘুড়ির সুতো ধরতে দিত না বলে তার এত রাগ হতো যে সে কাঁদতো। বাড়িতে তার বাবা তাকে তাদের চেয়ে অনেক ভালো ঘুড়ি কিনে দেবেন বলে সান্ত্বনা দিতেন। কিন্তু সে তাতে খুশি হতো না। তার

সাথীরা যা-কিছু নিয়ে খেলা করতো সে-সব নেবার জন্য তার মন ছটফট করতো।

একদিন তার বড় বোন মায়ের কাছে নালিশ করলে, "সবচাই আমাদের কিছু রাখতে দেবে না। ওর নিজের যতই থাক আমাদের নিজেদের কোন জিনিস ছুঁতে দেয় না।"

ওয়াঙ-গিন্নী উত্তর দিলেন, "থাম, থাম! ওর দোষ ধরতে হবে না। জানো তো ও ছেলে। ছেলেকে খুশি রাখতেই হবে। সে যা চাইবে তাকে দিতে হবে তা।"

মেয়েটি বললে, "বেশ। এরপর যদি আমাকে কোন কুকুরে তাড়া করে, তা'হলে আমি সেটাকে সবচাইয়ের পেছনেই লেলিয়ে দেবো।"

স্বার্থপরতার জন্যে কেবল একটি মানুষ তাকে বকতেন। তিনি তার ঠাকুমা। কিন্তু তিনি এমন নরম ভাবে তাকে বকতেন যে, তাঁর কথা সবচাইয়ের মনে পাঁচ মিনিটও থাকতো না।

এই ভাবে সে কিশোর থেকে হলো যুবক। তখন সে নিজেকে মনে করতে লাগলো বয়স্ক ও বুদ্ধিমান। একদিন তার বাবাকে বললে, "তুমি যদি আমাকে ঘরের কোণে আটকে রাখো, তা'হলে কি করে আশা করতে পারো যে, আমি টাকা রোজগার করবো? আমাকে সুযোগ দাও। আমি তোমাকে দেখাবো আমার মতো শক্তিমান ছেলে কি করতে পারে।"

সে-কথা শুনে তার বাবার ভারী আমোদ বোধ হলো। কিন্তু তিনি খুশি হলেন যে, সে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে

কিছু করতে চায়। বললেন, "আচ্ছা বাবা, আমি তোমাকে কিছু মূলধন দেবো। তুমি তাই নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে পারো। তবে তুমি এত বড় হওনি যে, নিজের জন্যে রোজগার করবে। তবে শিগগিরই তা দেখা যাবে। কাল তুমি একখানা ঠেলা-গাড়িতে বাগানের সবচেয়ে সেরা পীচফল ভর্তি করে নিয়ে নদীর ধারে পথে বিক্রি করো। তখন বুঝবো কতখানি সামর্থ্য তোমার হয়েচে।"

সবচাই তার বাবার কথায় খুশি হলো। পরদিন খুব ভোরে উঠে বাগানে গিয়ে সব চেয়ে বড় ও রসালো ফলগুলো

পেড়ে ঠেলাগাড়িখানি বোঝাই করে সে নিয়ে চললো নদীর ধারে বেচতে।

তখন আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি। সেদিন আবার ভারী গুমট। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ আছে। কিন্তু কোথাও এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। সেজন্য সারা দেশ যেন তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্চে। যতদূর চোখ যায় দেখা যাচ্চে রাস্তা দিয়ে নীল পোশাক পরে শ্রমিকেরা চলেচে কাজে, হাটুরেরা পশরার বোঝা নিয়ে যাচ্চে গাঁয়ের হাটে। কেউ কেউ বা তার গাধার পাশে পাশে চলেচে আর মাঝে মাঝে গাধাটিকে পা চালিয়ে চলবার জন্য তাগিদ দিচ্চে।

সবচাই তৃষিত পথিকদের মাঝ দিয়ে তার গাড়িখানি ঠেলতে ঠেলতে চলেচে আর ভাবচে, ফলগুলো সে বেশ দামেই বেচতে পারবে। দিনটা ভালোই। সে ঠিক করলে খরিদ-দারদের কাছ থেকে আদায় করবে চড়া দাম। তার বাবা যে দাম নিতে বলেছিলেন, সে দাম নেবে না। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি গিয়ে বেশি লাভের কথা বলে তাঁকে খুশি করে দেবে।

সে খরিদদারদের কাছে খুব দরদস্তুর করে পীচফলগুলো বেচতে লাগলো। তার থলেতে ঝন্-ঝন্ করতে লাগলো খুচরো। কিন্তু তার গাড়িখানি এত বড় ছিল যে, দুপুরেও খালি হলো না, অনেক ফল তাতে রয়ে গেল। তাই পথের ধারে একটা গাছতলায় সে বসলো বিশ্রাম করতে। তার কাছাকাছি অনেক শ্রমিক কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে ছিল।

তারা তার কাছ থেকে পীচফল কিনে ছায়ায় বসে আরামে খেতে লাগলো। যাদের কাছে পয়সা ছিল না, তারা বড় বড় পীচগুলোর দিকে লোলুপ-চোখে মিটমিট করে তাকাতে লাগলো।

সবচাইও বাড়ি থেকে যে রুটি এনেছিল তা খেতে লাগলো। এমন সময়ে সে পিছনে হঠাৎ একজনের পায়ের শব্দ শুনতে পেলো। সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, এক বৃদ্ধ লোলুপ-চোখে তার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসচে। লোকটির মুখে পাতলা দাড়ি কাশ ফুলের মতো সাদা, তার মাথায় এত কম চুল যে, তাই দিয়ে কোন রকমে একটি বেণী বেঁধেচে।

বৃদ্ধ তার কাছে আসতেই সবচাই সম্ভ্রমভরে জিগ্যেস করলে, "কি ওস্তাদ! আপনি কি একটা পীচফল কিনতে চান? এগুলো হচ্চে বাজারের সবচেয়ে সেরা।"

বৃদ্ধ বললে, "হায় আমার কপাল, ছোকরা! কিন্তু আমার কাছে পয়সা নেই।"

সবচাইয়ের গলার স্বর দমে গেল; সে বললে, "বটে!"

—"কিন্তু বাবা, তুমি এই বুড়োকে তোমার পীচফলগুলোর একটা দিতে পার? তোমার অতগুলো আছে, আমি চাইচি মোটে একটা।"

সবচাই কোন উত্তর দিলে না। তবে সবচেয়ে বড় ফলটা গাড়ি থেকে তুলে নিলে। তাই দেখে বুড়োর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু তাকে ফলটা না দিয়ে সবচাই নিজেই সেটা খেতে আরম্ভ করলো।

বুড়ো বড় দুঃখের সঙ্গে বললে, "তোমার এত রয়েচে, তবুও তুমি আমাকে একটা দিতে চাও না? আমি কাল থেকে অনেক পথ হেঁটে আসচি। আমার বয়স সত্তর বছরের ওপরে। আজ এক টুকরো রুটি কি এক চুমুক চা-ও খাইনি।"

সবচাই খপ করে বললে, "এই কাঠফাটা রোদে আমি ভিক্ষে দিতে আসিনি। আমার বাবার বাড়ির ফটকের সামনে দিয়ে রোজ এত ভিখারী যায় যে, তাঁর বাগানে যা ফলে তারা সে-সবই খেয়ে

ফেলতে পারে। যদি তোমার কাছে পয়সা থাকে তো আমি বেচতে রাজী। যদি না থাকে আমাকে আর জ্বালাও কেন?"

গাছতলায় যে সব পথিক বসেছিল তাদের মধ্যে জনকতক তাদের দুজনের কাছে এগিয়ে এলো। কিন্তু তাঁরা কেউ সবচাইয়ের পক্ষ নিলে না।

বৃদ্ধ মিনতি করে বললে, "আমি পিপাসায় মরে যাচ্চি। তুমি আমাকে বাঁচাতে পারো! তুমি কি দেখতে চাও যে, আমি মরি?"

যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের একজন বললে, "বুঝলে ছোকরা, বুড়োকে একটা পীচ দিয়ে ফেলো। তুমি যে দাম আদায় করচো তা থেকে বোঝা যায়, তুমি একটা ফল দান করতে পারো। যদি সব চেয়ে বড়টা না দিতে চাও, তা'হলে সব চেয়ে ছোটটা বেছে নিয়ে দাও। বুড়োকে পথের ধারে মরতে দিও না।"

কিন্তু সবচাই ভোলবার ছেলে নয়। তার বাবার কাছে যে পয়সাটি সে নিয়ে যেতে পারবে সেটি ভুলিয়ে তার কাছ থেকে আদায় করা কঠিন। সে বললে, ফলগুলো তার। সেগুলো ফেলে দেওয়া যায় না, এমন কি সব চেয়ে ছোটটিও নয়। জিনিসগুলো বিক্রির।

একজন বললে, "সৎকাজ করলে তোমার অনেক পুণ্য হবে!"

সবচাই বললে, "যদি পুণ্য সঞ্চয় করতে চাও, তা'হলে নিজের কড়ি দিয়ে কিনে ভিখারীটাকে দান কর না!"

"ভিখারী" এই কথাটি শুনে বৃদ্ধের মুখখানি রাঙা হয়ে উঠলো। মনে হলো, সে বহু চেষ্টায় চুপ করে আছে! যে লোকটিকে সবচাই কথাটা বলেছিল, সে চারধারে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের চোখে খেলো হবার ভয়ে এবং বৃদ্ধের জন্য বাস্তবিকই দুঃখিত হয়ে, একটি পীচের দাম সবচাইয়ের হাতে গুণে দিলে।

বৃদ্ধ রসালো ফলটি কৃতজ্ঞতাভরে নিয়ে খুশি মনে কামড়ে খেতে লাগলো। তার খাওয়া দেখে মনে হতে লাগলো, প্রতি গ্রাসে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। ফলটি খাওয়া হয়ে গেলে, তার চারধারে যারা ছিল তাদের দিকে সে ফিরে তাকালো। তারপর তাদের হাতছানিতে কাছে ডেকে, খুব ভালো করে নজর রাখতে বললে।

পীচের বীচিটা সে রেখে দিয়েছিল। সেটা হাতে নিয়ে বললে, "দেখ, এই ছোট বীচিটাতে এমন একটা শক্তি আছে যা থেকে আমরা সকলেই কিছু শিক্ষা পাবো।"

সে কি করে তা দেখতে, ততক্ষণে চারধারে যারা জড় হয়েছিল তারা তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলো। বৃদ্ধ গাছের ছায়া থেকে সরে গিয়ে এক জায়গায় মাটিতে গর্ত করে বীচিটা সেখানে পুতলে। তারপর গর্তটা নরম মাটি দিয়ে আলগা করে বুজিয়ে দিতে লাগলো। সকলের মনে হলো, তার হাতের ছোঁয়ায় মাটিগুলো আরও ভালো, আরও সরস হয়ে উঠচে। তাই দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। মাটি

চাপা দেওয়া হয়ে গেলে সে একজনকে এক ভাঁড় জল আনতে বললে। যাদুকরের কথায় একটি ছোট ছেলে ভিড়ের ভেতর থেকে জল আনতে ছুটে বেরিয়ে গেল। লোকটি কি আশ্চর্য ব্যাপার করে দেখবার জন্য তার বড় আগ্রহ।

জল আনা হলো। বৃদ্ধ যেখানে বীচিটা পুতেছিল সেখানে একটু জল ঢেলে দিলে।

তারপর খানিক সময় কেটে গেল। হঠাৎ সকলে অবাক হয়ে বলে উঠলো, "দেখ, দেখ। আশ্চর্য কাণ্ড! একটা গাছ গজিয়ে উঠচে!"

সবচাই ও আর সকলে দেখলে, তাদের চোখের সামনে গজাচ্চে ছোট একটি চারা। বৃদ্ধ তাতে যত জল দেয় চারাটি তত তেজে গজিয়ে ওঠে। তাতে সকলে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলো যে, মাথার ওপর আষাঢ়ের রোদের তাপও গেল ভুলে। গাছটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠতে লাগলো। তা থেকে চারধারে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সবুজ সুন্দর ডালপালা। শেষে দেখা গেল, যেখানে এক সময়ে কিছু ছিল না, সেখানে হয়েচে একটা বড় গাছ। তার তলায় ঘন শীতল ছায়া।

একজন বলে উঠলো, "লোকটা পরী।"

আর একজন বললে, "খুব সম্ভব গেছো-দেবতা।"

তৃতীয়জন বললে, "মুনি।"

কিন্তু বৃদ্ধ সে সব কথায় কান দিলে না।

সে বললে, "দেখ তোমরা! আমার কাজ এখনও শেষ হয় নি।"

তারা আবার গলা বাড়িয়ে দেখতে লাগলো। গাছের ডালে ডালে ধরলো হাজার হাজার কুঁড়ি। সেগুলো ফুলে উঠে পাপড়ি মেলে উঠলো ফুটে। গাছটাকে দেখাতে লাগলো সাদা। ফুলের সুগন্ধে চারধার মেতে উঠলো। গুনগুনিয়ে এলো মৌমাছি আর ভোমরার ঝাঁক। তারা ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াতে লাগলো। তারপর ফুলের পাপড়িগুলো পড়লো ঝরে। ফুলে ফুলে দেখা দিল ফলের কষি। মায়া-তরুটি পীচফলে গেল ছেয়ে। ফলগুলো হতে লাগলো বড়, আরও বড়। শেষে তাদের ভারে ডালগুলো পড়লো নুয়ে।

যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের মনে হতে লাগলো যেন স্বপ্ন দেখচে। তারা হঠাৎ যেন গিয়ে পড়েচে পরীর দেশে। তারপর তারা শুনতে পেল বৃদ্ধ বলচে, "ছেঁড়ো, খাও, পেট ভরিয়ে নাও। তোমরা যেমন আমাকে দয়া দেখিয়েচ সেই দয়ার প্রতিদান নাও।"

তার হাতের কাছে সব চেয়ে বড় ফলটি ছিঁড়ে নিয়ে যে লোকটি তাকে পীচ কিনে দিয়েছিল সে তার হাতে দিলে সেটি। তাই দেখে সবায়ের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। তারা সকলেই গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে নিয়ে চেখে দেখতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো! তাদের চোখের সামনে ঘটলো এমন একটা আশ্চর্য ব্যাপার। সেখানে এমন ভিড় জমে গেল যে, শেষ লোকটি যখন ফল ছিঁড়ে নিলে তখন গাছে একটি পীচও থাকলো না।

তখন যাদুকর গাছটার কাছে গিয়ে তার গায়ে আঙুলের কয়েকটি টোকা দিয়ে একটুক্ষণ চুপচাপ রইলো।

আর অমনি গাছটা শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করলো ; পাতাগুলো হলদে হয়ে গেল কুঁকড়ে, পড়লো ঝরে। একটু আগে যেখানে একটা গাছ ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে আবার দেখা দিল প্রখর রোদ।

যখন গাছটির ছড়ির মতো লম্বা, ছাল ওঠা একখানা কাঠ ছাড়া আর কিছু রইলো না তখন যাদুকর সেটাকে তুলে নিয়ে, কাউকে কিছু না বলে ধুলোভরা বড় রাস্তাটি দিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে গেল চলে। সকলে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। তাদের কারো মুখ দিয়ে একটি কথাও বার হলো না। শেষে সে সকলের চোখের আড়াল হয়ে গেল।

তখন সবচাই যেন স্বপ্ন থেকে চমকে জেগে উঠলো। মনে করলো, এবারে বেচাকেনা করা যাক, অনেক বেলা হয়েচে। এই ভেবে সে ঠেলা-গাড়িখানির দিকে ফিরে তাকালো। তাকাতেই তার চোখে পড়লো আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার —গাড়িখানি একদম খালি! তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল কান্নার মতো একটা শব্দ। নিমেষে সমস্ত ব্যাপারটার অর্থ তার মনের মধ্য দিয়ে খেলে গেল। স্বার্থপরের ভাগ্যে যে পুরস্কার লাভ হয় এক অলৌকিক ঘটনা তাকে দিয়েচে সেই পুরস্কার।

এইভাবে হলো সবচাইয়ের প্রথম শিক্ষা।

একদিন একটি ছোট ছেলের বাবা তাকে বললে, "লো-লি, আজ সকালে আমাকে শহরের আর এক দিকে যেতে হবে। তুমি ফটকের দিকে নজর রেখো, যেন কুকুর না ঢোকে। কারণ ওই বুড়ো শূকরীটার যদি কিছু হয় তা'হলে কি করে যে আমাদের শীতকালটা কাটবে জানি না। ওটাকে যদি বেচতে পারি তা'হলে যে লোকটির কাছে বেচবো সে আসবে আমার সঙ্গে ওকে নিতে।"

লো-লি উত্তর দিলে, "আচ্ছা! আমি সব দিকে নজর রাখবো।"

কিন্তু তার বাবা বেরিয়ে যাবার পরই কুড়ে ছেলেটা রোদে শুয়ে ঘুমুতে লাগলো।

লো-লি আর তার বাবা থাকতো পিকিং শহরের বাইরে একখানি ছোট কুঁড়ে ঘরে। ঘরখানির দেওয়াল মাটির ; চালে খড়। কুঁড়ের মধ্যে এক ধারে ছিল একটা ইটের বেদী। তার ওপর তারা দুজনে শুতো। সেইজন্য বেদীটার ওপর ছিল কতকগুলো ছেঁড়া কম্বল পাতা। ঘরখানার আর একধারে ছিল একটা মাটির উনুন। আর ছিল একটা লোহার পাত্র, খান কয়েক ভাঙা চীনেমাটির ডিশ, গোটা দুই কাঠের টুল। তারা গরিব কিনা। তখন চীনদেশের অনেকেই আমাদের মতো খুব গরিব ছিল। লোকটির সব চেয়ে দামী

সম্পত্তি ছিল সেই বুড়ো শূকরীটা। সেইটেকেই ওয়াঙ লো-লিকে পাহারা দিতে বলে গেল।

কুঁড়ে ঘরখানার সামনে ছিল ছোট একটু উঠোন, এত ছোট যে সেখানে শূকরীটার গড়াবারও স্থবিধে ছিল না। তার ফলে অর্ধেক সময় সে ঘরের মেঝেতেই গড়াতো।

তা লো-লি ঘুমোচ্ছে।

সে বুঝতেই পারলে না, কতক্ষণ ঘুমিয়েচে। কিন্তু চমকে জেগে উঠে ঘুম-চোখে চারধারে তাকাতে লাগলো। দিনটি ছিল চমৎকার। ঘুমটা তার বেশ লাগছিল। তাই জেগে উঠে তার ভালো লাগলো না। যাই হোক, এখন তার বাবা যে কোন মুহূর্তে বাড়ি এসে পড়তে পারে। তাকে পাহারা না দিতে দেখে যদি ঘুমুতে দেখে, তা'হলেই বিপদ।

সে চোখ রগড়ে, আড়ামোড়া ভাঙলে। হঠাৎ তার মনে হলো, চারধারে সব কেমন নিঝুম। ব্যাপারটা ভারী আশ্চর্যের ঠেকলো। তাদের শূকরীটা তো কখন এমন চুপচাপ থাকে না। আর কোন শব্দ না শোনা যাক, তার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শোনা যাবেই।

লো-লি লাফিয়ে উঠে চারধারে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। দেখলো শূকরীটার চিহ্ন অবধি নেই। সে ছুটে কুঁড়ের ভেতর এলো। কুঁড়েটা খালি। সে পাগলের মতো ছুটে গেল উঠোনে ফটকটা দেখতে। দেখলে ঘুমোতে যাবার আগে সেটাকে সে যেমন রেখে গিয়েছিল তখনও তেমনি শক্ত ভাবে বন্ধ আছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কেউ ঢোকে নি। সে দেওয়ালের দিকে

তাকালো। সেটাও ঠিক আছে। চালের দিকে দেখলো। সেখানেও শুকরীটা নেই।

কুঁড়ের মধ্যে ছুটে এসে বিছানা হাঁতড়ে দেখলো। কম্বলগুলো খুললো, নাড়া দিল—শুকরীটাকে দেখতে পেলো না। সে নিচু হয়ে লোহার পাত্রটার ভেতর পরীক্ষা করলে—নাঃ, তার মধ্যে একটু ঘোঁৎঘোঁতানিও শোনা যাচ্চে না।

সে ভাবলে নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখচে। এমন সময় সে শুকরীটার চীৎকার শুনতে পেলো। মনে হলো, শব্দটা ঠিক বাইরে থেকে আসচে। সে ছুটে ফটকে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলো। দেখলো এক বুড়ো দূরে মিলিয়ে যাচ্চে। এ ছাড়া আর কিছু তার চোখে পড়লো না। বুড়ো লাঠি ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আস্তে আস্তে চলছিল। লো-লির কানে তখনও শুকরীটার চীৎকার বাজছিল। তাই তার মাথায় ভালো-মন্দ আর কোন ভাবনাই এলো না, ছুটলো বুড়োর পিছনে। ও লোকটা নিশ্চয়ই জানে তাদের শুকরীটার কি হলো।

সে বুড়োর কাছে যেতে যেতে বলে উঠলো, "মশায়! ও মশায়! আমাদের শুকরীটাকে দেখেচেন? যদি দেখে থাকেন দয়া করে বলুন না সেটা কোথায়?"

বুড়ো ছেলেটার ভয় দেখে হেসে বললে, "কোন্ শূকরীটা বাবা? তুমি কি বলচো?"

লো-লি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, "আমাদের শূকরীটা! আমার বাবা সেটা আমাকে পাহারা দিতে বলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

—"ঘুমিয়ে ছিলে? খাসা চৌকিদার তো তুমি! তাই নয়? এখন তুমি জেগে দেখলে, শূকরীটা নেই। তোমাকে উচিত শাস্তি দিয়েচে, দেয়নি?"

ছেলেটি কাতরভাবে বলে উঠলো, "না, মশায়! তার কথা যদি কিছু জানেন তো দয়া করে বলুন।"

—"তোমার সেই নোংরা জানোয়ারটার জন্যে এত হৈ-চৈ করচো কেন, বাপু ?"

লো-লি সজল চোখে বললে, "যদি সেটাকে কেউ নিয়ে যায় তা'হলে আমরা না খেয়ে মরবো।"

—"ঘুমোতে যাবার আগে তোমার সে কথা ভাবা উচিত ছিল।"

—"ফটকটা বন্ধ ছিল। তাই আমি ভাবতেই পারিনি যে, কিছু হতে পারে। আমি মিনিটখানেক ঘুমিয়েছিলাম।"

—"অথচ ঘুমিয়েছিলে দু' ঘণ্টা। আমি সব জানি।"

লো-লি কাতরভাবে বলে উঠলো, "দয়া করুন। দয়া করুন। বলুন, এখন কি করবো ?"

—"অমন করে চেঁচিও না বাপু ! আশ-পাশের সবাই এখনই আমাদের কাছে এসে জড় হবে। তোমার কঁ্যাক-কঁ্যাকানি শুনে তারা মনে করবে আমরা দুজনে মুরগীর ছানা চোর। চুপ করে থাকতে চেষ্টা কর।"

লোকটি লো-লির চীৎকারে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে আবার আস্তে আস্তে চলতে লাগলো। কিন্তু লো-লির মনে হলো, সে যেন কোথা থেকে একটা চাপা চীৎকার শুনতে পাচ্চে। মনে হচ্চে, শব্দটা লোকটির লম্বা-ঢিলে পোশাকের মধ্যে কোথাও থেকে আসচে।

সে রেগে চীৎকার করে উঠলো, "এই শয়তান চোর ! তুই আমাদের শূকরী চুরি করেছিস্। এখন সেটাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করচিস্।"

এই বলে সে বুড়োর লাঠিখানা চেপে ধরলো। লাঠিখানা ধরতেই তার শরীরটা কেমন শিউরে উঠলো। মনে হলো, তার শরীরের হাড়গুলো কে টেনে খুলচে, গায়ের মাংসকে পাকাচ্চে। তারপরই দেখতে পেলো, দুপায়ে ভর দিয়ে না হেঁটে সে হাঁটচে চার পায়ে ভর দিয়ে।

বুড়ো বললে, "লো-লি।" এই প্রথম সে তার নাম ধরে ডাকলে।

—„লো-লি, এতদিন তুমি ছিলে অলস, আর কিছু না। আজ তোমারই অসাবধানতায় তোমাদের শূকরীটা হারিয়ে গেচে। আমাকে প্রথমে জিগ্যেস করেছিলে, সেটা কোথায় গেল। শেষে আবার আমাকেই চোর ধরচো। কিন্তু জেনে রাখো, আমি হচ্চি লোহার ডাণ্ডা নামে পরী। আমি ভালো কাজ ছাড়া করি না। তোমার শয়তানীর শাস্তি দেবার জন্যে, তোমাকে শিক্ষা দিতে আমি তোমাকে শূকরী করেচি। তোমার এটা হওয়া দরকার। তোমার বাবা যে শূকরীটা হারিয়েচেন, তুমি এখন তার জায়গায় গিয়ে শুয়ে থাক।"

এই কথা বলে বুড়ো অদৃশ্য হয়ে গেল, আর লো-লি সেই জায়গাটিতে শুয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলো। এর পর সে করবে কি ? হায় রে ! যদি সে ভালো ছেলে হয়ে থাকতো ! কিন্তু এখন আর তা হবার উপায় নেই।

ঠিক তখনই একটা কুকুর রাগে ডাকতে ডাকতে ছুটে বেরিয়ে এসে দাঁত বার করে তাকে তাড়া করলো। শূকরকে কুকুর বরাবরই ঘৃণা করে। লো-লি যত জোরে

পারলে দিলে ছুট। আর কুকুরটাও ছুটতে ছুটতে তার পিছনের পা কামড়াতে লাগলো। ছুটতে ছুটতে সে দেখতে পেলো, তাদের বাড়ির ফটকটা। সে সেটাকে যেমন খোলা রেখে গিয়েছিল, ফটকটা তখনও তেম্নি খোলা রয়েচে; তার মধ্য দিয়ে ছুটে গিয়ে সে বাড়িতে ঢুকে পড়লো। সে জানতো, কুকুরটা সেখানে আসবে না।

সে ঘরে ঢুকে মেজেয় শুয়ে হাঁফাতে লাগলো। ভয়ে তার সারা শরীর কাঁপচে। সে কুকুরটার মুখ থেকে বড় বাঁচা বেঁচে গেচে। তার পিছনের পা দুখানার কয়েক জায়গায় রয়েচে কুকুরের দাঁতের দাগ, জায়গাগুলো জ্বালা করচে। হঠাৎ তার বাবার কথা মনে পড়ে বুক কেঁপে উঠলো। এখনই তিনি বাড়ি আসবেন। আর, যদি বেচাকেনা ঠিক হয়ে গিয়ে থাকে, তাঁর সঙ্গে আসবে ব্যবসায়ীটা। কি ভয়ানক ব্যাপার! তাকে, লো-লিকে সত্যিই কশাইয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে কেটে, তার মাংস বাজারে বেচা হবে।

সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তবুও লাফ দিয়ে উঠে ভয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে পাগলের মতো ফটকের দিকে ছুটলো। ভাবলে, হয়তো তেমন ভাবে মরার হাত থেকে পালাবার উপায় তখনও আছে।

কিন্তু ঠিক তখনই দুটি লোক খোলা জায়গাটা দিয়ে ঢুকে তাকে উঠোনে তাড়িয়ে নিয়ে এলো।

তার বাবা বলে উঠলেন, "এই হতভাগা লো-লি, ফটকটা এমন করে খোলা রাখার মানে কি? এদিকে নজর

নেই কেন ? কি ? ছোঁড়াটা এখানে নেই ?" বলে তিনি চারধারে তাকাতে লাগলেন, কুঁড়ের মধ্যে তাকিয়ে দেখলেন। "না, সে এখান থেকে চলে গেচে। যদি আমরা ঠিক সময়ে না এসে পড়তাম, শূকরীটা পালাতো। এই দেখুন শূকরীটাকে, দেখতে চমৎকার নয় ? ষাঁড়ের মতো মোটা-সোটা, এর মতো আর একটাকেও আপনি শহরের এ অঞ্চলে খুঁজে পাবেন না।"

ব্যবসায়ীটা লো-লিকে ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলো, তার পাঁজরায় হাত দিলে, মুখের ভেতরটা লক্ষ্য করে মাথা ঝাঁকালে, লম্বা, ঝোলা কানের লতি দুটো তুললে।

লো-লি তার বাবাকে চেঁচিয়ে বলবার চেষ্টা করতে লাগলো, সে সত্যিই কে। কিন্তু তার গলা দিয়ে শূকরের ডাকের মতো কেবল একটা শব্দ বার হলো। ইতিমধ্যে ব্যবসায়ীটার কথা শুনে তার হৃদ্‌পিণ্ডটা আরও জোরে দুলতে লাগলো। সে কি রকম করে তাকে কাটতে চায় সে কথা কানে শুনতে পারলো না। এ কি হতে পারে যে, তার বাবা তাকে কেটে ফেলবার জন্যে বেচবেন ? সে আবার আপত্তি জানাবার চেষ্টা করলে। ফলে সে একবার 'কিঁক' করে উঠলো। তা শুনে লোক দুটি হেসে উঠলো।

ব্যবসায়ীটা বললে, "ও বুঝতে পেরেচে আমি কে। শূকরীটা বুদ্ধিমতী ! ও যদি আমার সঙ্গে যায় তা'হলে ওকে বলবো, সম্রাটের জন্মদিনে যে ভোজটা হবে, তার জন্যে সৈন্যদের কাছ থেকে দশটা শূকরের ফরমাজ পেয়েচি। সেগুলোকে কেটে তাদের খেতে দেওয়া হবে।"

লো-লির রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এলো। 'তাকে কেটে ভোজে খেতে দেওয়া হবে!'

হায় রে! কেন সে কুড়েমি করে ঘুমোলো? কেন

বাবার অবাধ্য হলো? কেন তাঁর কথামতো জেগে রইলো না?

কিন্তু তারা তার দিকে মনোযোগ না দিয়ে দর কষাকষি করতে লাগলো।

শেষে ব্যবসায়ীটা বললে, "আচ্ছা, আপনি দামটা অনেক চাইলেও আমি ওটাকে নেবো। আমরা দুজনে পুরানো বন্ধু, আপনি বলে রাজী হলাম। বাইরে আসুন টাকা গুণে দিচ্ছি।"

তারপর ধপ্ করে পড়লো লো-লির পিঠে লোকটার মোটা লাঠির বাড়ি। আর লো-লি ভয়ে যন্ত্রণায় ফটকের দিকে দিল লাফ। পালাবার আশা ছেড়ে দিয়ে সে পাগলের মতো ছুটে চললো। অমনি দুপাশ থেকে তাকে তাড়া করলো দুটো কুকুর। আরও কতকগুলো শূকর পথে দাঁড়িয়ে ছিল। কুকুর দুটো তাকেও তাদের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিল। ব্যবসায়ীটির সহকারী ছায়ায় এক জায়গায় বসে ছিল। সে উঠে দাঁড়ালো।

লো-লির দিকে তাকিয়ে বললে, "ওটা হচ্চে সব চেয়ে মোটা। ওর মাংস খেতে ভারী ইচ্ছে হচ্চে।"

ব্যবসায়ীটা লা-লির বাবার হাতে খুচরো গুণে দিতে লাগলো। খুচরোগুলো এক সঙ্গে হাজারটা করে এক একটি গেঁজেয় বাঁধা ছিল। লো-লির বাবার অনেক খুচরো হলো। তাই ঝোলাটা হলো বেশ বড়। সে খুশি হয়ে ফটকে ঢোকবার জন্যে ফিরলে।

লো-লির কানে গেল, "ছোঁড়াটা গেল কোথায় ? আজ ওকে সঙ্গে করে কোথাও নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়াবো মনে করেছিলাম, কিন্তু ক্ষুদে শয়তানটা এমন কুড়ে। নেই, বাঁচা গেচে।"

তারপর তার বাবার আর কোন কথা সে শুনতে পেল না।

লো-লির বুক দুঃখে ভেঙে যেতে লাগলো। সে দেখলে, তাকে ধুলোভরা রাস্তা দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলেচে। তার নাকে-মুখে ধুলোর মেঘ ঢুকতে লাগলো। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। সে যেই দম নেবার জন্য থামে, অমনি তার পিঠে পড়ে লাঠি বা কুকুর দুটোর একটা তার পা দেয় কামড়ে। তার ফলে সে আবার চলে। চলতে চলতে সে ভাবে, সেই তার শেষ চলা। সম্রাটের জন্মদিনে তাকে সবাই খাবে ! এত অল্পবয়সে কি দারুণ অবস্থা তার ! ছাগল-গরু-ভেড়া প্রভৃতি প্রাণীদের দুরবস্থার কথা সেই প্রথম সে বুঝতে পারলে। তারা মরে কেবল তাদের প্রভু ও মালিকদের জন্যে।

অবশেষে তারা এলো খোঁয়াড়ে। লো-লি আর তার সাথীদের সেই খোঁয়াড়টার মধ্যে পোরা হলো। তার মধ্যে আরও অনেকগুলো শূকর কাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল। সেও সেখানে গিয়ে শুয়ে কাঁপতে লাগলো। তাকে যে কখন কাটবার জন্য ধরতে আসবে !

জায়গাটায় কি বিশ্রী গন্ধ ! আহা ! তার বাবার বাড়িখানা ছিল কি চমৎকার ! সেখানে ছিল তপ্ত রোদ, পরিষ্কার জায়গা। সে খেতে পেতো গরম রুটি ! যদি সে আবার ফিরে

যেতে পায়! কেন, কেন সে অলস হলো? তার বাবা তাকে যা করতে বলেন, সে যদি তা করতো তা'হলে হয়তো এত গরিব তারা হতো না।

ঠিক তখনই সে দেখতে পেলো, দুটি লোক তার দিকে আসচে। একজনের হাতে রয়েচে একগাছি দড়ি আর একজনের হাতে একখানি বড় ছুরি।

তাদের মধ্যে একজন হাসতে হাসতে লো-লিকে দেখিয়ে বললে, "এইটাকে প্রথমে নেওয়া যাক্। দেখে মনে হচ্চে ও চায় আমরা ওকে কাটি।"

এই বলে সে লো-লির একখানা পা ধরে তাকে খোঁয়াড় থেকে টানতে টানতে নিয়ে চললো আর লো-লি প্রাণপণে শূকরের মতো চীৎকার করতে লাগলো। তাকে পাশের দিকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে মেঝেয় ফেলে দিল। তারপর যে লোকটার হাতে ছুরি ছিল সে তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে ছুরিখানার ধার ও আগা আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো।

লো-লি বুঝতে পারলে তার শেষ হয়ে এসেচে। সে পাগলের মতো চীৎকার করে উঠে যেখানে শুয়েছিল সেখান থেকে দিল ছুট, আর প্রাণপণ শক্তিতে বলতে লাগলো, "আমাকে ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! আমি শূকর নই।"

একটা জোর হাসির শব্দ তার কানে এলো। আর সেই সঙ্গে তার বাবার পরিচিত গলার স্বর শুনে সে আশ্চর্য হয়ে গেল।

"তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ? স্বপন দেখছিলে, শূকর হয়ে গেচ ? ঠিক হয়েচে ! অকর্মা কোথাকার।"

লো-লি আস্তে আস্তে চোখ মেললো। প্রখর রোদের ফলে সে প্রথমে কিছুই দেখতে পেলো না। বুঝতে পারলে না কোথায় আছে। তারপরই বুঝতে পারলে, সে রয়েচে

তাদেরই বাড়ির উঠোনে, তার বাবা দাঁড়িয়ে রয়েচে তার পাশে। হাসিতে তার মুখখানা কুঁচকে গেচে।

লো-লি পাগলের মতো চারধারে তাকিয়ে জিগ্যেস করলে, "শূকরীটা কি এখনও এখানে আছে?"

তার বাবা উত্তর দিলে, "নিশ্চয়ই। তার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্চো না? কিন্তু সেজন্য বাহাদুরীটা তোমার নয়।"

লো-লি বললে, "বাবা আমি আর কখন তোমার কথা-মতো কাজ করতে ভুলবো না। ঠিক মনে রাখবো।"

পরে সে তার কথা রেখেছিল।

অনেকদিন আগে লো-সান নামে একটি অন্ধ ছেলে ছিল। তারা ছিল বড়ই গরিব। তাদের বাড়ি-ঘর ছিল না। বড় কষ্টে দিন কাটতো। একদিন তার মা-বাবা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। বললে, "তুই ভিক্ষা করে খা। আমরা আর তোকে খাওয়াতে পারবো না।"

এ ছাড়া তাদের আর কিছু করবার উপায়ও ছিল না। লো-সান তাই মনের দুঃখে পথে বেরিয়ে পড়লো। হাতে লাঠি নিয়ে শহর ও গাঁয়ের পথে পথে সে বেড়াতে লাগলো। লাঠিখানির সাহায্যে সে পথ ঠিক করে চলতে শিখলো। লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে সে শহরের চারধারে, পাশের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার পথের একটুও ভুল হয় না।

তার সঙ্গী হলো একটি কুকুর। কুকুরটির সঙ্গে তার অনেক দিনের ভাব। সে তার নাম দিয়েছিল ফ্যাং। ফ্যাং তার হয়ে ভিক্ষে করতে লাগলো। পথিকের পায়ের শব্দ কানে এলেই লো-সান তিনবার আঙুল মটকায় আর ফ্যাং হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে পথিককে কোটো মানে দণ্ডবৎ

করে। তাই দেখে পথিকরা এত খুশি হয় যে, ছেলেটির হাতে পয়সা দিয়ে যায়। কিছুদিন পরে শহরের অনেকের সঙ্গে ছেলেটির ভাব হলো। তাকে লাঠি ঠক্ ঠক্ করে যেতে দেখলেই তারা ডেকে কথা বলতে লাগলো।

একদিন শেষ বেলার দিকে লো-সান আর তার কুকুরটি গাঁয়ের পথে পথে বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় পৌঁছলে সন্ধ্যা নামলো। কাছে বাড়ি-ঘর কোথাও ছিল না। অন্ধকার ক্রমে জমাট হয়ে আসতে লাগলো। অবশ্য তার জন্য তাদের মনে ভয় হলো না। এমন কতদিন গেচে যে, ভিক্ষেয় বেরিয়ে তাদের দুজনকে পথের ধারে কোথাও রাত কাটাতে হয়েছে।

তাই রাত কাটাবার সুবিধামতো একটা জায়গা তারা খুঁজতে লাগলো। এ কাজে ফ্যাংই তার প্রভুর বড় সহায়। সে এধার-ওধার খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় একটা ঝাঁকড়া গাছ দেখতে পেলো। তার তলাটি পরিষ্কারও ছিল। সেখানে শুয়ে আরামে রাত কাটানো যেতে পারে।

সে ঘেউ ঘেউ করে সুখবরটা তার প্রভুকে জানিয়ে দিল। তার মনিব কুকুরের দু-চারটি ভাষা জানতো। ডাক শুনে বুঝতে পারলো ব্যাপার কি। সে লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে গাছটার কাছে গেল। তারপর গুটিসুটি হয়ে দুটিতে বিড়াল-ছানার মতো সেখানে শুয়ে পড়লো এবং একটু পরেই তাদের চোখে গাঢ় ঘুম এলো।

রাতের বেলা লো-সান এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলো। একজন

তাকে খুব কোমল স্বরে ডাকলে, "লো-সান, লো-সান, তুমি আমায় দেখতে পাচ্চো ?"

ছেলেটি বড় দুঃখে উত্তর দিল, "হায় ! আমি অন্ধ ।"

—"বাছা, সত্যিই তোমার বড় কষ্ট। হয়তো আমি তোমার কোন উপকারে আসতে পারি ।"

লো-সানের মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ; সে বললে,

"মশায়, আপনি কি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারেন? দেবেন কি?"

—"না বাবা, আমি দেবো না, কিন্তু তুমি নিজেই যাতে তা পারো তাই সম্ভব করে দেবো। আমি যা বলি তা মন দিয়ে শোন। তারপর নিজেই নিজের চিকিৎসা করো। আজ থেকে তুমি যখনই একটি করে ভালো কাজ করবে, তা সে যত সামান্যই হোক তোমার দৃষ্টিহীন চোখে একটু করে আলো ঢুকবে। ভালো কাজের সংখ্যা যত বাড়বে ততই দেখবে তোমার চোখ দুটির অবস্থা বদলে যাচ্চে। শেষে যে বাধার দরুণ তুমি দেখতে পাও না তা একেবারে দূর হয়ে যাবে। তুমি চোখ দুটি ফিরে পাবে। কিন্তু যদি ভালো কাজ না করে, লোকের অনিষ্ট করে দিন কাটাও, তোমার মনে যদি অনিষ্ট চিন্তা থাকে তা'হলে ভালো কাজ করে যা লাভ করবে, তাতে পাবে তার দ্বিগুণ খারাপ ফল, চোখ দুটি হয়ে পড়বে আরও খারাপ।"

এই বলে সেই বিচিত্র কণ্ঠস্বর নীরব হলো; লো-সানও চমকে জেগে উঠলো। তার মুখে রোদ এসে পড়েছিল। তার মনে হতে লাগলো, সারা জগৎ যেন আগের চেয়ে আরও আনন্দময় হয়ে উঠেচে। ফ্যাংকেও মনে হতে লাগলো সুখী। সে সহানুভূতি দেখিয়ে তার ছোট্ট প্রভুটির হাত চাটতে লাগলো।

ফ্যাং যেন তারই মত সব শুনেচে, সবই বুঝতে পেরেচে এমি ভাবে সে তাকে জিগ্যেস করলে, "আমরা এরকমের কাজ করবো কি, ফ্যাং?"

ফ্যাং প্রভুর কথা শুনে আনন্দে ডেকে উঠলো।

"বেশ। মনে হচ্চে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবো। কিন্তু তুমি ছাড়া আমি তো কিছুই করতে পারি না--এ তো তুমি জানই", এই বলে লো-সান প্রকাণ্ড কুকুরটির লোমে নরম গলাটি দুহাতে জড়িয়ে ধরলে।

তারপর দুটিতে চললো শহরের দিকে। কিন্তু লো-সান স্বপ্নে যে কথাগুলো শুনেছিল সেগুলো ভুলতে পারলে না। পরীর কথাগুলো কেবলই তার মনে বাজতে লাগলো। আহা! সে যদি চোখ দুটি ফিরে পায়! তা'হলে সে তার নিষ্ঠুর মা-বাবাকে দেখাবে সে কি না করতে পারে। তাঁরা যে অবস্থায় জীবন কাটাচ্চেন সে অবস্থা থেকে তাঁদের সে তুলবেই।

সে ফটক দিয়ে শহরে ঢুকতে যাবে এমন সময় পথের ধারে যে বুড়ো ভিখারীটা পড়েছিল তার গায়ে হোঁচট লাগলো।

লোকটি বলে উঠলো, "এই অন্ধ বুড়োকে একটা পয়সা দাও, বাবা। দয়া কর।"

লো-সান হেসে বললে, "কিন্তু, বন্ধু, আমাদের দুজনের অবস্থাই সমান। কারণ আমিও অন্ধ।"

—"হায় কপাল! আমার অবস্থা আরও খারাপ। আমি খোঁড়াও।"

লো-সানের বড় দুঃখ হলো। তার কাছে ছিল মোটে একটি পয়সা। সে সেটিই বার করে লোকটির হাতে দিয়ে বললে, "এটা নাও। আমার এইটিই সম্বল ছিল।"

হঠাৎ তার চোখের সামনে একটা আলোর চমক দিল

বলে মনে হলো। যে অন্ধকার এতকাল জমাট বেঁধে ছিল এখন তা যেন একটু পাতলা হয়ে গেল।

সে আনন্দে বলে উঠলো, "স্বপ্নটা বাস্তবিকই সত্যি।"

যারা তার কথাগুলো শুনতে পেলো তারা মনে করলে ছেলেটা পাগল হয়ে গেচে; তাই আপন মনে কথা বলচে। সে যাবার সময় যাতে তাদের গায়ে ছোঁয়া না লাগে সেজন্য তারা কাপড় গুটিয়ে নিলে। সেদিনকার মতো লো-সানের মন আর কখন হাল্‌কা হয় নি। তার মনে হলো সারা জগৎই তাকে দেখে হাসচে।

শহরের উত্তর-ফটকের ঠিক বাইরে ছিল ভিখারীদের জন্য একটি ভাঙা-চোরা মন্দির। পূজারীরা অনেক দিন থেকে সেখানে পূজো করা ছেড়ে দিয়েছিল। যাদের বাড়ি-ঘর ছিল না, পথে পথে ঘুরে বেড়াতো, সবাই পরামর্শ করে বাড়িখানা রেখে দিয়েছিল তাদের জন্য। লো-সান সে রাতে ঘুমোলো সেখানে।

তার এক কোণে পড়ে ছিল এক বুড়ী। না খেয়ে খেয়ে সে এমন দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, নড়বার-চড়বার শক্তিও তার ছিল না। লো-সান তাকে তার রুটিখানা দিল। সেটা ছিল তার রাতের খাবার। আবার তার দৃষ্টি যেন একটু পরিষ্কার হয়ে এলো। চোখে দেখা দিল সামান্য একটু আলো। লো-সানের বড় আশ্চর্য বোধ হলো। আনন্দও হলো কম নয়। কিন্তু রুটিখানা দান করে সে ও ফ্যাং পেটে ক্ষিদে নিয়েই ঘুমোতে বাধ্য হলো।

তাই রাতে তার ভালো ঘুম হলো না! ক্ষিদের জ্বালায় খুব ভোরেই লো-সানের ঘুম ভেঙে গেল। সে উঠে

কুকুরটাকে নিয়ে খাবারের সন্ধানে ধুলোভরা পথ দিয়ে চলতে লাগলো।

তখনও পথে লোক চলা-চল শুরু হয় নি। কাজেই ভিক্ষে পাওয়া মুশকিল। লো-সান তাই ভাবচে কি করে খাবার জোটাবে। এমন সময় ফ্যাংই সমস্যার সমাধান করলে। পথের এধার থেকে ওধারে তখন যাচ্ছিল একটা মুরগীর ছানা। ফ্যাং ছুটে গিয়ে সেটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো। কাছে-কিনারে কেউ ছিল না। একখানা গাড়ির শব্দও শোনা যাচ্ছিল না। লো-সান বুঝলে চমৎকার সময়। লো-সান ছানাটিকে ফ্যাংয়ের মুখ থেকে টেনে নিলে। ফ্যাংয়েরও বড় আনন্দ হলো। সে আহ্লাদে ডাকতে লাগলো। তার মনের ভাব যেন সে মস্ত এক কাজ করেচে।

সেখান থেকে বাজারটা ছিল মিনিট বিশেকের পথ। লো-সান নদীর ধারের সেই বাজারে গিয়ে ছানাটাকে বেশ ভালো দামেই বেচলে।

কিন্তু খরিদদার তার হাতে দামটা গুণে দিতে না দিতেই লো-সানের মনে হলো তার চোখের সামনে কালো কি একটা নেমে এলো। দুটি ভালো কাজের জন্য সে যে পুরস্কার পেয়েছিল একটি খারাপ কাজে তা সে হারিয়ে ফেললে। তার অবস্থা হলো সেই গাছতলায়-শুয়ে স্বপ্ন দেখবার আগের মতোই।

তবে সে সহজে দমলো না। বুঝতে পারলে একটা খুব অন্যায় কাজ করেচে। তাই যেখান থেকে মুরগীর ছানাটা চুরি করেছিল সেখানে ফিরে চললো ছানাটার মালিকের

সন্ধানে। কিন্তু সারাদিন ঘুরে ঘুরে, লোককে জিগ্যেস করেও জানতে পারলে না কার মুরগীর ছানা হারিয়েচে। সন্ধ্যাবেলা তার পা দুখানি আর চলে না, মুখখানি ধুলোয় কালো, সে হাসি-খুশি ভাব নেই। ভোরে তার পেটে যে ক্ষিদের জ্বালা ছিল এখন তা এত বেড়ে উঠেচে যে, সে আর সইতে পারচে না। তবুও সেই মুরগী-ছানা বিক্রির টাকা কয়টি সে কিছুতেই খরচ করলে না।

পরদিন ভোরে তার ঘুম ভাঙলে দেখতে পেলো তার চোখের দৃষ্টি যেন মায়াবলে আবার একটু ভালো হয়ে উঠেচে। অন্যায় করে তার জন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশটা বৃথা যায় নি।

তারপর থেকে পর পর অনেকগুলো ভালো কাজ করে তার চোখ দুটির দৃষ্টি এত তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠলো যে, তার কাছে কেউ এলে কিছুদূর থেকে তাকে সে একটু দেখতে পেতে লাগলো! কেবল তাই নয়, তার মনে হতে লাগলো, সে যেন সূর্যাস্তের রাঙিমাও একটু দেখতে পায়। এই অবস্থায় এসে তার আনন্দের সীমা থাকলো না। সে সঙ্কল্প করলো ভিক্ষে করে সে যা পায় তা থেকে যতখানি সম্ভব জমিয়ে রেখে এক জোড়া চশমা কিনবে। সে শুনেচে, যাদের চোখ খারাপ তারা চশমা পরে।

কিন্তু একদিন তার সঙ্গে সেই অন্ধ খোঁড়া লোকটির দেখা হলো যাকে সে একদিন তার শেষ সম্বলটি পর্যন্ত দিয়েছিল।

লোকটি আজও তার কাছে ভিক্ষা চাইলে। লো-সানের

কাছে অনেক পয়সা থাকলেও সে বললে, "কিন্তু ভাই, আমার কাছে কিছুই নেই।"

লোকটি কাতরভাবে বললে, "কিন্তু আমি যে না খেতে পেয়ে মরচি।"

লো-সান উত্তর দিল, "আমারও সেই অবস্থা।"

হঠাৎ কেমন একটা মোচড় দিল আর সব অন্ধকার হয়ে উঠলো। সূর্যাস্তের রাঙিমা সে আর দেখতে পেলো না।

এবার লো-সান বড় হতাশ হয়ে পড়লো। সে ভালো থাকবার, একটিও খারাপ কাজ না করবার কত চেষ্টা করেচে! কিন্তু তার জন্য কি পুরস্কার পেলো?

সে ভাবতে লাগলো, "যেই একটু আলো দেখতে পাই, যেমনি একটু লাভ হয়, অমনি সব যায় হারিয়ে, চোখে আবার দেখি অন্ধকার।"

সে যে কি করবে ভেবেও পায় না। সে অন্ধ। তার জীবনে লাভই বা কি? সংসারে তার আছেই বা কে? সে বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো।

সমস্ত পৃথিবীর ওপর, প্রতিবেশীদের ওপর, নিজের ভাগ্যের ওপর তার বড় রাগ হলো। সে নদীর ধারে বসে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবতে লাগলো।

তখন বর্ষাকাল। নদীর জল ফুলে উঠে গর্জন করে ছুটে চলেচে। সে তীরে বসে নানা কথা ভাবতে লাগলো। ভাবতে লাগলো শৈশবের কথা, মা-বাবার কথা, খেলার সঙ্গীদের কথা। জীবনে তার সুখ কি? পৃথিবীতে তার একমাত্র বন্ধু

হচ্চে কুকুরটি। তার জীবনকে সুখী করবার, তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার সাধ্য তার নেই। চোখ না থাকলে মানুষ কি করতে পারে? জীবনে তার উন্নতি কোথায়?

সে বললে, "ফ্যাং, আমার জন্যে তোমার যথাসাধ্য তুমি করে থাক, কিন্তু তবুও আমাকে বাঁচাতে পার না।"

কুকুরটা কৃতজ্ঞতাভরে প্রভুর মুখ চাটতে লাগলো।

লো-সান বললে, "সংসারে আমার বলতে কেবল তুমিই আছ। তোমাকে আমার কাছ থেকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। তুমি না থাকলে আমি মরে যাবো।"

ঠিক তখনই নদীর ধার থেকে একজন চীৎকার করে উঠলো, "একটা লোক ডুবে যাচ্চে। ও সাঁতার দিতে পারচে না।"

তার হাঁক শুনে চারধার থেকে লোক ছুটে এলো। দেখতে দেখতে সেখানে হলো উত্তেজিত জনতার ভিড়। সকলেই ডুবন্ত লোকটাকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। কিন্তু তাকে বাঁচাবার একটু চেষ্টাও করলে না।

তারা চীৎকার করে উঠলো, "লোকটা দুর্বল হয়ে পড়েচে। লোকটা এতক্ষণ নৌকা ধরে ভাসছিল। কিন্তু সেটাও ওর হাত থেকে ফসকে গেচে। তীরে ওঠার আশা ওর আর নেই। ও শীঘ্রই ডুবে মরবে।"

লো-সান হট্টগোলটা শুনতে লাগলো। আর তার মনে বড় দুঃখ হতে লাগলো। লোকগুলো কি করে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে একটা লোককে তাদের চোখের সামনে মরতে

দেখচে ? তাকে বাঁচাবার একটুও চেষ্টা তারা করচে না ? আজ যদি সে ওদের কারো মতো হতো, যদি তার চোখ থাকতো তা'হলে এখনই দেখিয়ে দিত। ওরা ভীরু, কাপুরুষ ! শক্তি রয়েচে, তবুও একটা লোককে বাঁচাচ্চে না।

হঠাৎ তার বুকের ভেতর কেমন একটা উৎসাহ দেখা গেল। সে ভাবলে, "একি সম্ভব ? সে অন্ধ। তবুও এই ভীরু, নিষ্ঠুরের দল যা করচে না, সে তা করবে।"

সে চীৎকার করে বলে উঠলো, "ফ্যাং, লোকটিকে বাঁচাতে পারে। আমার এই কুকুরটা ওকে বাঁচাবে।"

যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মধ্যে একটি লোক বললে, "থামো। চুপ কর।"

লোকটি লো-সানকে চেনে ; ভিক্ষা করবার সময় তাকে বহুবার দেখেচে। লো-সানের বন্ধুর কাজ করতে তার বড় ইচ্ছা হলো। আবার বললে, "লোকটিকে বাঁচাবার আশা আর নেই। তুমি কুকুরটাকেই হারাবে, ওকে বাঁচাতে পারবে না। লোকটা ডুবে মরুক। ও হচ্চে একটা ভিখারী।"

লো-সান তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "আমিও তাই। যে যা, সে তার মতো লোককেই সাহায্য করবে। একথা কি জানো না ?"

এই বলে সে কুকুরটার গলা ধরে তাকে নদীর একেবারে তীরে টেনে এনে চীৎকার করে উঠলো, "ফ্যাং, শিগগির যাও। ঝাঁপিয়ে পড়—একটা লোক ডুবচে। ওকে নিয়ে এস।"

কুকুরটা যেন তার মনিবের কথা বুঝতে পারলে। সে

একবার ঘেউ করে ডেকে উঠেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর লোকটির দিকে সাঁতরে চললো।

তীরের লোকদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়লো। তারা বলতে লাগলো, "এখন গিয়ে আর কি হবে? ও আর ভেসে থাকতে পারচে না। কুকুরটা কাছে যাবার আগেই লোকটা ডুবে যাবে।"

লো-সান চোখের জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে উঠলো। আহা! এখন যদি তার চোখ থাকতো! তখনকার মতো চোখের জন্য এমন ব্যাকুল সে আর কখন হয় নি। বাইরে তার সামনে নদীতে তখন কি অবস্থা, তা যদি সে দেখতে পেতো!

অবশেষে সেই অলস লোকগুলোর চীৎকার শুনে বুঝতে পারলে, লোকটা প্রাণপণে ভেসে থাকবার চেষ্টা করচে। সে বুঝতে পেরেচে, কুকুরটা তাকে বাঁচাতে আসচে।

ফ্যাং দ্বিগুণ শক্তিতে ঢেউ ঠেলে, স্রোত কেটে লোকটির দিকে সাঁতরে চলছিল। তার মনিব তাকে কাজটি করতে বলেচে। তার কর্তব্য হচ্চে, মনিবের আদেশ পালন করা।

সে যেন বুঝতে পেরেছিল, স্রোত লোকটিকে কতদূরে কোন্‌খানে টেনে নিয়ে যাবে। তাই সে কৌশলে সেইদিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। সে একটু একটু করে লোকটির কাছে গিয়ে পড়ছিল। তারপর সে লোকটির ছেঁড়া জামাটা দাঁত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরতেই তীরের জনতা আনন্দে চীৎকার করে উঠলো। লোকটিকে ঠিক সেই মুহূর্তে না ধরলে সে নিশ্চয়ই ডুবে যেতো।

তারপরই শুরু হলো, ফ্যাংয়ের আর সেই লোকটির জীবন-মরণের যুদ্ধ। সে লোকটিকে মুখে করে কূলের দিকে ফিরে আসতে লাগলো। তার চোখ দুটি রয়েচে তীরে তার মনিবের দিকে। লো-সানও আর সকলের মতো তীরের এধার-ওধার করছিল আর চীৎকার করে তাকে উৎসাহ দিচ্ছিল। সে হাতছানিতে তাকে ডাকছিল।

অবশেষে তীরের একটি লোক, তার হাতে ছিল একখানা আঁকশি, ডুবন্ত লোকটির জামায় আঁকশিখানা কোন রকমে আটকে দিলে।

কুকুরটা যেন বুঝতে পারলে, তার আর লোকটার জামা ধরে রাখবার দরকার নেই। সে তাই তৎক্ষণাৎ লোকটিকে ছেড়ে দিলে। যে লোকটি আঁকশি দিয়ে টানছিল, সেও সেই মুহূর্তে তাকে নিলে তীরে টেনে।

কিন্তু বেচারী ফ্যাং! সে তীরে উঠতে পারলে না; হঠাৎ পাকের টানে পড়ে তখনই তলিয়ে গেল।

তার সেই অবস্থা দেখে তীরের লোকগুলো চীৎকার করে উঠলো। লো-সান তাই শুনে বুঝতে পারলে, ফ্যাংয়ের কি অবস্থা হয়েচে। সে আর বেঁচে নেই।

দুঃখে তার বুক ভেঙে গেল। সে করুণ স্বরে কেঁদে উঠে মাটিতে উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ে তীরের কাদায় মুখখানি চেপে রইলো। যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল তারা লো-সানের দিকে কৌতূহলভরে একটুখানি তাকিয়ে থেকে যে যার বাড়ি চলে গেল। তখন রাত হয়ে আসছিল।

তারপর ভোর হলো। কিন্তু আজ তার সেই ভক্ত বন্ধুটি নেই। আজ আর কেউ তার হাত চাটলো না, তাকে জাগতে দেখে আনন্দে একবার ডেকেও উঠলো না। কিন্তু সে মাথা তুলতেই তার চোখ দুটি সুন্দর আলোয় ধেঁধে গেল। সে অবাক্ হয়ে চারধারে তাকাতেই নানা রকমের জিনিস তার চোখে পড়তে লাগলো। তার সামনে বয়ে চলেচে উচ্ছল নদী, তার তীরে গাছ-পালা, জলে ভাসচে নৌকো। তার পিছন দিকে উঠেচে নগরের প্রাচীর; মাথার উপর আকাশ, মেঘ, আলো, নানা রঙ্। সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লো। হায় রে! এই সুন্দর পৃথিবীকে সে এতকাল দেখতে পায় নি! সে এতকাল পেয়েছিল এর শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ। আজ সে দেখতে পেলো এর রূপ—সুন্দর! এর তুলনা সে দেবে কার সঙ্গে? কিন্তু তার এই দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে গেচে ফ্যাং—তার বন্ধু, তারই মতো ঘরছাড়া একটি কুকুর। সে এক ভিখারীর জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েচে।

চোখের মতো অমূল্য সম্পদ তো আর কিছুই নেই। দুঃখের মাঝেও লো-সানের বড় আনন্দ হতে লাগলো। সে চারধারে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। সেই সময় দেখলে, একটি লোক তার দিকে আসচে।

সে লোকটির মূর্তি দেখতে পাচ্ছিল, তার মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। লোকটি ক্রমেই তার কাছে এগিয়ে আসতে আসতে একেবারে তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

সে বললে, "বাবা, তুমিই কাল আমার জীবন বাঁচিয়েচ!"

লো-সান আগ্রহের সঙ্গে লোকটির মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালো। তার বড় ইচ্ছা হতে লাগলো লোকটির চেহারা ভালো করে দেখতে যার জন্য সে সব হারিয়েচে।

লোকটি বলে উঠলো, "কি! তুমি? লো-সান? যাকে আমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম?"

লো-সানের মন বেদনায় মুষড়ে পড়লো। সে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইলো। তা'হলে এই লোকটি হচ্ছে তার বাবা। তিনিই তার উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলেন, তাঁরই জন্য সে তার ভক্ত কুকুরটিকে বিসর্জন দিয়েচে? তার মনে কতকগুলো কথার উদয় হলো। যে তার ওপর এত খারাপ ব্যবহার করেচে, হয়তো কথাগুলো তাকে আর একটু হলেই বলতো। কিন্তু ঠিক তখনই কে যেন তার মনের মধ্যে বলে উঠলো, "লো-সান! ইনি তোমার বাবা!"

লো-সান নিজেকে সামলে নিয়ে হাত বাড়িয়ে বললে, "বাবা?"

লোকটির মন গলে গেল। সে তাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরলে। তারপর বললে, "আমি বড় অন্যায় করেচি। তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু শেষে তুমিই আমার জীবন রক্ষা করলে!"

লো-সানও তার বাবাকে মনের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে জড়িয়ে ধরতেই তার চোখে যে ছালখানা তখনও লেগে ছিল তা খসে পড়লো। তখন থেকে সে সব কিছু দেখতে লাগলো আরও পরিষ্কার।

অনেক কাল আগে প্রাচীন কংফূ নগরে ফ্যান নামে একটি পরিবার বাস করতো। প্রথমে তারা ছিল একটি ছোট খামারের মালিক। কিন্তু কঠিন পরিশ্রম করে, খুব হিসেব করে চলে আরও বিঘে কতক জমি সংগ্রহ করে, সম্পত্তিটা বাড়িয়ে তোলে। তারপর থেকেই তাদের অবস্থা বেশ ভালো হতে লাগলো, দিন কাটতে লাগলো সুখে।

তারা কয়েকটি মজুর রাখলে। মজুরেরা ক্ষেত-খামারে খাটে। গোলায় ধান ও গম মজুত হয়। এমন সময় বাড়ির কর্তার একদিন খুব অসুখ হলো। সেই অসুখেই তিনি মারা গেলেন। তখন সংসারে রইলো কেবল তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র ছেলেটি।

লোকটি মারা গেলে তাঁর স্ত্রীর এত দুঃখ হলো যে, বেচারী অনেক দিন বিছানায় পড়ে রইলো, উঠতেই পারলো না। তারও হলো অসুখ। ঘরে ছেলেটি ছাড়া আর কেউ নেই। কাজেই সেই তার মায়ের সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলো। একে বাবা মারা গেল, তার ওপর আবার মায়ের অসুখ। দুঃখে ছেলেটির বুক ভেঙ্গে যেতে লাগলো। সে মায়ের জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে উঠলো; তার বিছানার কাছটিতে বসে বসে ভাবে, 'কবে মা সেরে উঠবে।'

এক সময় তার মনে হলো, মা বুঝি আর বিছানা থেকে উঠবেন না, মারা যাবেন। কারণ তিনি কিছুই খেতে চান না।

সে তাঁকে যা-কিছু খেতে দেয় তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন।

কপালে হাত দিয়ে দেখে, গরম আগুন। সে কি যে করবে, ভেবে পায় না।

শেষে তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, একদিন মূর্ছা গেলেন। সেই ভাবে পড়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে ছেলেকে কাছে ডাকলেন।

মাকে কথা বলতে শুনে ছেলের বড় আনন্দ হলো। মনে করলে, বিপদ যা ছিল, কেটে গেল। সে তাড়াতাড়ি মায়ের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

কিন্তু কয়েক মিনিট মা একটি কথাও বলতে পারলেন না। তাঁর মাথায় ছিল কালো চুল! কিন্তু জট পাকিয়ে গিয়েছিল। সে মায়ের চুলগুলোতে হাত বুলোতে বুলোতে লক্ষ্য করলে, তাঁর চোখে সেই অস্থির দৃষ্টি আর নেই।

তারপর, কথা বলবার মতো শক্তি পেলে মা বললেন, তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেচেন। তিনি দেখেচেন, যেন এক পরী তাঁর মাথার কাছে এসে বলচে "তুমি যদি মাছ-মাংস ছেড়ে দাও, নিরামিষ খাও, শুদ্ধ-শান্ত হয়ে থাকো, তোমার মৃত-স্বামীর কথা ভাব, শাস্ত্র মেনে চলো, তা'হলে জীবনে বিশেষ কষ্ট পাবে না। তোমার অসুখও সেরে যাবে।"

ছেলে মায়ের কথা শুনে আশ্বস্ত হলো। পরীর কথামতো চললে তিনি সেরে উঠবেন। তবে আর কি? বললে, "মা, তুমি সেই ভাবেই চলো। না হলে তোমাকে বাঁচাতে পারবো না। তুমি না বাঁচলে জীবনে আমার আনন্দ কি?"

মা বললেন, "আচ্ছা বাবা, পথটা যখন তোমার মতেও

ভালো তখন আমি তেমনি ভাবেই চলবো। তবে আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই। বেশ, তুমি পুরুতকে ডেকে পাঠাও। আমি তাঁর সামনেই শপথ করবো।"

পুরুতকে ডেকে পাঠান হলো। পুরুত এলে ছেলেটির মা তাঁর সামনে শপথ করলেন, জীবনে মাছ-মাংস ছোঁবেন না, নিরামিষ আহার করবেন।

তাঁর প্রতিজ্ঞা শুনে পরীটি বোধ হয় খুশি হলো। কারণ কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বিছানা ছেড়ে উঠবার মতো শক্তি পেলেন। ক্রমে তাঁর শরীরও বেশ ভালো হয়ে উঠলো। তিনি ঘর-সংসার ও কাজ-কর্ম দেখতে লাগলেন। ছেলেটি বড় খুশি হলো। সে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে লাগলো। তার বাবার

অভাবে বিষয়-সম্পত্তির কিছুই যাতে নষ্ট না হয় সে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করলে।

সে সকাল-সন্ধ্যায় তার বাগানখানি কোপায় ; জল যাবার জন্য নালা কাটে, ঠেঙা দিয়ে মাটির বড় বড় ডেলা ভাঙে। গ্রামের সকলের আগে ঘুম থেকে উঠে সে বাগানে যায় কাজ করতে, আবার সন্ধ্যায় সকলের শেষে কাজ সেরে বাড়ি ফিরে আসে। রোদ, বৃষ্টি, শীত কিছুই সে মানে না, একটা না একটা কাজ নিয়ে থাকে। শীতকালে সে অঞ্চলে পড়ে দারুণ শীত। ঠাণ্ডায় হাত-পা যায় জমে, আড়ষ্ট হয়ে! তার প্রতিবেশীরা তখন কুড়েমির একটা ছুতো পেয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে। কিন্তু তার বিশ্রাম নেই, সে সমানে খেটে চলে।

প্রতিবেশীরা বলে, "বাপু, তুমি দেখছি খেটে খেটে মরবে।"

তাদের কথা শুনে সে বলে, "তোমরা কি জান না, কুনফুসিয়স্ বলেচেন, 'যে শ্রমিক ভালো করে কাজ করতে চায় তাকে প্রথমে তার যন্ত্র-পাতি দুরস্ত করে নিতে হবে?' যখন মাটিতে তুষার জমে থাকে তখন যদি কাজ না করি তা'হলে কাজ করবো কি করে? নববর্ষ অবধি অপেক্ষা কর। দেখবে আমি তখন খেলবার জন্য প্রস্তুত।"

তার বন্ধুরা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলেও মনে মনে তার প্রশংসা করে, তাকে বলে 'কংফু' মানে 'কাজ'। সকলেই বলে, কালে সে ধনী হয়ে উঠবে। সেটা তাদের গ্রামের সম্মান।

এলো নববর্ষ। কংফু তার প্রতিজ্ঞামতো নববর্ষের

উৎসবের ভোজে যোগ দিয়ে শুক্লপক্ষের প্রথম দিনটি থেকে পনেরো দিন খুব আমোদ-প্রমোদ করলে।

একদিন উৎসব থেকে বাড়ি ফিরবার পথে মায়ের কথা ভেবে তার বড় দুঃখ হলো। ভাবলে, মা তার এই আনন্দোৎসবে যোগ দিতে পারচেন না, তিনি দিন দিনই শুকিয়ে রোগা হয়ে যাচ্চেন। এমন কি তিনি বাড়ি থেকে কোথাও বা'র হন না, কেবল তাঁত আর চরকা নিয়ে থাকেন। খানও খুব কম। তাতে শরীর টিকতে পারে না। তিনি যেন কোন রকমে বেঁচে আছেন। তাঁকে যদি বলকারক কিছু না খাওয়ানো যায় তা'হলে শীঘ্রই মারা যাবেন। তাই সে খানিকটা মাংস আর কয়েক রকমের খাদ্য কিনে নিয়ে বাড়ি এলো।

বাড়ি এসে মাকে সে বললে, "মা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার কর্তব্যপরায়ণ ছেলে হবার চেষ্টা করেচি। তুমি তার প্রতিদানে আমাকে একটা জিনিস দেবে না?"

কংফুর মা তার হাতখানি চেপে ধরলেন। তাঁর মনে হলো হয়তো দুঃখের সময় তাঁর এই একমাত্র ছেলেটির প্রতি তিনি কোন রকম অবহেলা করে থাকবেন। সংসারে তাঁর আছে কেবল সেই ছেলেটি, তার জন্যই তাঁর যত ভাবনা। তাই বললেন, "বাবা, তুমি সত্যই আমার মাতৃভক্ত ছেলে। আমার ইচ্ছামতো তুমি চলে থাকো। তুমি যা চাও আমি খুব খুশি হয়েই তা দেবো।"

ছেলেটি আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলো, "বেশ, তা'হলে

তোমার ঘরে যাও। আজ রাতে আমি রান্না করবো। দেখো, আমি ভালো রান্না করতে পারি।"

কংফু তার মায়ের জন্য রান্না করতে লাগলো। মুরগীর একটি ছানাকে সে সুন্দর করে ছাড়ালো। তারপর রসুন ও মশলা দিয়ে নানা রকমের তরকারি মিশিয়ে চটকে জিনিসটিকে ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে সেগুলোকে এক একটি ময়দার লেচির মধ্যে পুরে সিদ্ধ করলে। তারপর মাকে ডাকলে খেতে। বললে, "মা, এসো; খাবার তৈরী।"

মা ছেলেকে খুশি করবার জন্য তার তৈরী খাবার বেশ আনন্দের সঙ্গেই খেলেন। তাঁর একবারও সন্দেহ হলো না যে, তিনি মাংস খাচ্চেন। খাবার কাঠি দুটি বাটি থেকে তাঁর মুখে যেন খুব খুশি হয়ে উঠতে লাগলো। তিনি সমস্ত খাবারই খেয়ে ফেললেন।

খাবার পর দুজনে বিশ্রাম করতে লাগলেন। মায়ের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তাঁর মনে হতে লাগলো তিনি যেন অনেক দিন পরে গায়ে বল পেয়েচেন। আর কংফু বড় খুশি হলো যে, তার মতলবটি চমৎকার খেটেচে। সে আবার এম্নি করে মাকে খাওয়াবে।

তারপর দুজনে নিজের নিজের ঘরে শুতে গেলেন। হঠাৎ গভীর রাত্রে তার মায়ের ঘর থেকে গোলমাল ও হাসির শব্দে কংফুর ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো কতকগুলো অচেনা লোক যেন হট্টগোল করচে। সে তাড়াতাড়ি উঠে মায়ের ঘরে

ঢুকতে যাবে এমন সময় একটি তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনতে পেলো। তাতে বুঝতে পারলো তার মা ভীষণ বিপদে পড়েচেন। তার পরই সে শুনতে পেলো, অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ আর একজনের কাতর কান্না—যেন কে মারা যাচ্চে।

সে এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে এক লাফে মায়ের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু দেখে অবাক হয়ে গেল যে, ঘরে কেউ নেই। তার মায়ের বিছানা ও ঘরখানা খালি। তার মা কোথায় গেলেন ?

গরাদে দেওয়া জানালাটা তেম্নি বন্ধ ছিল, খিলটাও যেমন লাগানো ছিল তেম্নি লাগানো আছে। এ কি ? কংফু ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দরজাটি ছাড়া ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আর পথও নেই। সে যখন আসছিল তখনও তার পাশ দিয়ে কেউ যায় নি। সে শব্দ শোনা মাত্রই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেচে। তখনও চলন-পথটা ছিল খালি।

তার হাত-পা কাঁপতে লাগলো। সে অবস্থায় সে ছোট প্রদীপটা জ্বেলে ঘরখানির ভেতর চারধারে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলে। কিন্তু বিছানার ওপর কেবল কম্বলখানি ছাড়া আর কোন কিছু ওলট-পালট অবস্থায় দেখতে পেলো না! সে তখন ঘরের প্রত্যেকটি কোণ, প্রত্যেকটি ফাটল, প্রত্যেকটি জায়গা তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগলো—যদি সেই দারুণ রহস্যের কোন সূত্র চোখে পড়ে। এমন সময় টেবিলের ওপর দেখতে পেলো, একখানি লাল কাগজ। তাতে লেখা আছে বিচিত্র ভাষা আর আঁকা

আছে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষসের মূর্তি। মূর্তিটার কবলে রয়েচে একটি স্ত্রীলোক।

যে ব্যাপার ঘটেচে কংফু তাতে ভয়ে একেবারে সারা হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি গেল মন্দিরে। সেখানে সেই পুরুতটি থাকতেন যাঁর সামনে তার মা শপথ করেছিলেন। সে পুরুতকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তাঁকে সব কথা জানালে।

পুরুত তার সব কথা শুনে বললেন, "বাবা, তুমি বলচো রাতের খাবার তৈরী করেছিলে তুমি। বেশ ভালো করে ভেবে দেখ। কি দিয়ে খাবারটা তৈরী করেছিলে ?"

কংফু তাঁর কাছে কোন কথা গোপন করলে না, সব বলে গেল। বললে, মাকে সে বড় দুর্বল হয়ে পড়তে দেখে নববর্ষের উৎসবে তাঁকে পুষ্টিকর খাবার তৈরী করে দিয়েছিল। বাজার থেকে কি কিনেছিল, কি করে খাবার তৈরী করেছিল সে সব জানালো। আরও বললে, মা জানতেনই না যে তিনি কি খাচ্চেন। তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে খাবারটা খেয়েছিলেন।

পুরুত জিগ্যেস করলেন, "তুমি বলচো তিনি পিঠেগুলো খেয়েছিলেন ?"

—"হাঁ, খুব তৃপ্তির সঙ্গে। তাঁকে খেতে দেখে আমার বড় আনন্দ হয়েছিল। তিনি কত কষ্ট যে সহ্য করতেন।"

—"তা'হলে কি তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নি ? দেবতাদের সাক্ষী রেখে তিনি যে শপথ করেছিলেন তা কি ভঙ্গ হয় নি ? তিনি কি মাংস খান নি ? তুমি বলচো, খাবারে মুরগীর বাচ্চার মাংস ছিল।"

—"কিন্তু পুরুত মশায়, এটা কি নববর্ষ নয় ? অন্য সময়ে যে কাজ করলে পাপ হয় এখন আমরা তা কি করতে পারি না ? তাতে তো দোষ নেই। বিজ্ঞেরা কি নববর্ষে আমাদের আমোদ-প্রমোদ করতে বলেন না ? যাতে বছরের শেষে আমরা ভালো করে কাটাতে পারি ?"

—"হাঁ, বাবা, তুমি যা বলচো তা ঠিক। কিন্তু বছরের এই সময়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবার কোন বিধিও নেই। এমন কোন সময় নেই যখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা যেতে পারে, আর তা করলে কোন শাস্তি হবে না। তোমার মাকে উপদেবতারা ধরেচে। তুমি এই যে কাগজখানি পেয়েচো এ থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্চে। তাঁকে তারা নিয়ে গেচে পাতাল-পুরীতে শাস্তি দিতে। মাটির তলায় যে সব পিশাচের বাসা এই দেখ তাদের শীলমোহর আর সাঙ্কেতিক চিহ্ন। হায়! না জেনে তোমার মায়ের ভাগ্যে এত দুঃখ-যন্ত্রণা আনলে। তারা তোমার মাকে খুব সামান্য খাদ্য দেবে। তার ফলে তিনি তিলে তিলে শুকিয়ে মরবেন। তোমার মাকে সব সময়ে তাঁর পাপের কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য পিশাচগুলো তেমন ব্যবস্থা করবে।"

কংফুর মন দুঃখে ভার হয়ে উঠলো। সে না জেনে কি ভয়ানক ভুল করেচে! সেই ভুলের জন্যেই আজ তার এত দুঃখ।

সে চোখের সামনে দেখতে লাগলো তার মাকে। তিনি কত কষ্ট পাচ্চেন! তিনি তাকে বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি বুঝতেই পারেন নি কি কৌশলে সে তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

করচে। তবে সেও বিশ্বাস করতো নববর্ষের আনন্দোৎসবে প্রতিজ্ঞা পালনের দরকার নেই। কিন্তু তার এই বিশ্বাসের ফলে তিনি পাতালপুরীতে যে ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্চেন তা তো দূর হবে না।

তিনি সেখানে কষ্ট পাবেন আর সে চুপ করে বসে বসে সেজন্য দুঃখ করবে মাত্র, এ হতে পারে না। সে তা হতেও দেবে না। সে দেখবে, তার মাকে সাহায্য করবার কোন উপায় আছে কি না। তার ঘরে খাবারের অভাব নেই। কিন্তু মায়ের সঙ্গে যদি সে তা ভাগ করে না খায়, তা'হলে তার মতো হতভাগ্য সন্তান আর নেই।

সে সময়ে ফুংটু নগরে একটি খুব পুরোনো মন্দির ছিল। যে পাতালপুরীতে পিশাচেরা থাকতো তার সঙ্গে একটা সুড়ঙ্গপথে মন্দিরটির যোগ ছিল। এই পথটির কথা প্রত্যেকেই জানতো, কিন্তু কেউ সেখানে যেতে সাহস করতো না। তাদের ধারণা ছিল, গেলেই সেখানকার পিশাচদের হাতে পড়তে হবে। পিশাচেরা একবার ধরতে পারলে কত রকমে যে যন্ত্রণা দেবে তার ঠিক নেই।

তবে কংফু তাতে দমলো না। সে মাকে বড় ভালোবাসে। তার দোষেই তাঁর এত কষ্ট। তাঁর কষ্ট সে দূর করবে। তার মনে ভয়ের নাম মাত্র নেই। মাকে সাহায্যের চেষ্টা সে করবে। তাতে কোন অপদেবতাই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা তাকে তাঁর কাছে যেতে বাধা দিতে পারে, কিন্তু তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সে যদি

প্রথমবার তাঁর কাছে যেতে না পারে, দ্বিতীয়বার চেষ্টা করবে। সে তাঁর কাছে যাবেই।

এই ভেবে সে খানিকটা পায়স তৈরী করে একটি ছোট মাটির হাঁড়িতে তা নিয়ে একদিন মায়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। পথে কত বিপদ। তবুও সে চললো।

মন্দিরটা খুঁজে নিতে তার কষ্ট হলো না। তাদের প্রতিবেশী

পুরুতটি সেই মন্দিরের পুরুতকে একখানি চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠির জোরে মন্দিরটিতে সে ঢুকতে পেল। না হলে সেখানে

ঢোকা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। কারণ মন্দিরটির দরজা সব সময় খোলা থাকতো না।

মন্দিরে ঢুকে সে বুড়ো দরোয়ানের হাতে কয়েকটি পয়সা গুঁজে দিয়ে বললে, "খুড়ো, আমাকে সুড়ঙ্গটা দেখিয়ে দাও। জায়গাটা দেখতে আমার বড় ইচ্ছে।"

বুড়ো দেখলে, ছেলেটির মুখখানি বেশ, চোখ দুটিতে শয়তানির কোন চিহ্ন নেই। তাই তাকে অন্ধকার গহ্বরটার কাছে নিয়ে গিয়ে মরচে-ধরা দরজাটা দেখিয়ে দিলে।

বুড়োর হাতে আর একটা পয়সা গুঁজে দিয়ে কংফু বললে, "খুড়ো, ওর মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে দেখতে দাও। যন্ত্রণা দেবার জায়গাটা কি রকম একবার দেখতে মন বড় চাইচে।"

বুড়ো ভয়ে আঁৎকে উঠে বললে, "না, না!"

কিন্তু কংফুও ছাড়বার ছেলে নয়। সে বুড়োকে নানা কথা বলে তার মন গলিয়ে ফেললে। শেষে বুড়ো সুড়ঙ্গের দরজাটা না খুলে আর পারলে না।

দরজাটা খোলা হতেই কংফু বুড়োকে আর কিছু না বলে, পাল্লাটা এক টানে খুলে ফেলে সুড়ঙ্গের অন্ধকারে ঢুকে পড়লো।

সুড়ঙ্গটা ক্রমেই নিচের দিকে নেমে গিয়েছিল। কংফু জানতো, সেটা চলে গেচে তার মায়ের কাছে মাটির নিচে চোরা-কুঠুরি অবধি! সে চললো সুড়ঙ্গপথে সেই দিকে। বুড়ো তাকে ফিরে আসবার জন্যে কত ডাকলে, কিন্তু সে ফিরে এলো না। বুড়োরও সাহস হলো না যে তার পিছু নেয়।

কংফু অন্ধকারের ভেতর দিয়ে সারাদিন চলতে লাগলো; দেওয়ালের গায়ে যে-সব ভয়ঙ্কর ছবি আঁকা ছিল, সেগুলোর ভয়ে তার হাতের মশালটি জ্বালতে সাহস হলো না। ছবি-গুলোকে সে দেখতে পাচ্ছিল না বটে, কিন্তু সেগুলোকে যেন অনুভব করছিল। অন্ধকারেই সেগুলো যেন দেওয়ালের গায়ে জ্বলে উঠছিল।

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে সে পথের ধারে মাটিতে একটু হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো। মনে করলে—একটু পরেই আবার চলবে। কিন্তু তার চোখে ঘুম নেমে এলো; সে পড়লো ঘুমিয়ে। সেই অন্ধকারে ঘুমে তার কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল।

শেষে কথা-বার্তায় ও হাসির শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু তার কাছে কেউ যে আছে তা সে দেখতে বা অনুভবও করতে পারলে না। সে তাড়াতাড়ি মশালটা জ্বাললে। অমনি সুড়ঙ্গটা আগের মতোই শান্ত, শব্দশূন্য মনে হতে লাগলো। কাউকে কোথাও দেখতে পেলো না।

তাতে তার ধারণা হলো সে স্বপ্ন দেখছিল। সে মাটির হাঁড়িটা তুলে নিয়ে আবার চলবে, এমন সময় দেখতে পেলো হাঁড়িটা খালি। পায়সটা নেই। কিন্তু কি করে যে পাত্রটা শূন্য হলো তার কোন চিহ্ন পর্যন্ত সে মাটিতে বা আর কোথাও খুঁজে পেলো না। তার একটি দানা কি একটি ফোঁটাও কোথাও পড়ে নেই। সে ঘুমের ঘোরে যাদের কথাবার্তা আর হাসি শুনেছিল, তারা হচ্ছে উপদেবতা।

তারা অপেক্ষায় ছিল, সে কখন ঘুমোবে। ঘুমোলেই তারা পায়সটা খেয়ে পালাবে।

কংফুর দুঃখ হলো বটে, কিন্তু বসে বসে দুঃখ করে সময় নষ্ট করা তার স্বভাব নয়। সে আবার চেষ্টা করবে বলে ফিরে চললো। সে মায়ের কাছে যাবেই। তিনি যে কি বিপদে রয়েচেন!

সে নিরাপদে কিন্তু খুব ক্লান্ত হয়ে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর বাড়ি এসে আবার পায়স তৈরী করে মায়ের জন্য মন্দিরে নিয়ে গেল। কিন্তু বুড়ো দরোয়ান এবার আর তার কথায় ভুললো না। কংফু কত অনুনয়-বিনয় করলে।

বুড়ো বললে, "বাবা, সেবার তুমি আমাকে ঠকিয়েচো। এবার আর তোমাকে ওর মধ্যে ঢুকতে দেবো না।"

কংফু তখন তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটি খুলে বললে। তার কথা শুনে বুড়োরও মনে কষ্ট হলো। বললে, "যে ভাবে তুমি মা হারিয়েচো তাতে আমার মনে দুঃখ হচ্চে। এরপর আর তোমাকে ফিরাতে পারি না। যাও, দেবতারা তোমার সহায় হোন।"

কংফু আবার চললো সেই ভীষণ সুড়ঙ্গপথে। কিন্তু সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, এবার পথে কিছুতেই এক মুহূর্তও বিশ্রাম করবে না। বিশ্রাম করতে বসলেই সে ঘুমিয়ে পড়বে। তখন উপদেবতারা এসে তার পায়স চুরি করে খেয়ে ফেলবে।

সে চলচে। চলতে চলতে, চলতে চলতে সুড়ঙ্গটার

একেবারে শেষে এসে পড়লো। কিন্তু তারপর সে আর এগোতে পারলে না। দেখলো, তার সামনে রয়েচে আগুনের বিশাল দেওয়াল। আগুনটা এমন ভয়ঙ্কর গর্জন করছিল, তা থেকে এমন চট্‌পট আওয়াজ হচ্ছিল যে, সবচেয়ে সাহসী লোকও ভয়ে পিছিয়ে আসবে। কিন্তু কংফু একটুও ভয় পেলো না, গায়ের চাদরখানা খুব ভালো করে মাথায় জড়িয়ে প্রথমে তার মাথাটি সেই আগুনের ভীষণ ঢেউয়ের মধ্যে দিলে ঢুকিয়ে। তারপরই দেখলে, আগুনটা নিরাপদে পার হয়ে এসেচে, তার গায়ে একটুও আঁচ লাগে নি !

কিন্তু হাঁড়ির পায়স হয়তো আগুনে পুড়ে গিয়ে থাকবে, এই মনে করে সে ঢাকনাটা খুলে তার মধ্যে যেমনি দেখেচে, অমনি তার মাথার ওপর হুস্‌-হুস্‌ করে কিসের যেন শব্দ হলো ; সেই সঙ্গে কারা যেন ভাঙা গলায় হেসে উঠলো। হাসির শব্দটা তার চেনা। আগে সে এম্নি হাসিই শুনেছিল। সে হাঁড়ির ঢাকনাটা চেপে ধরলে যাতে পায়সটা না কেউ খায়। কিন্তু হায় ! তার আগেই হাঁড়িটা খালি হয়ে গিয়েছিল। উপদেবতারা তার সবটুকু চেটেপুটে খেয়েছিল।

এবারও কংফুর চেষ্টা হলো বিফল। সে মায়ের কাছে যেতে পারলে না। তবু সে নিরুৎসাহ হলো না। সে বাড়ি ফিরে চললো। এবার বুঝতে পারলে, তাকে কৌশলে পায়সটুকু বাঁচিয়ে পথটা পার হয়ে মায়ের কাছে যেতে হবে।

ফেরবার সময় সে আগুনের দেওয়ালটা আর দেখতে পেলো না। পথ চলতে চলতে ভাবতে লাগলো, কি করে

উপদেবতাদের চোখে ধুলো দিয়ে পায়সটুকু বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। শেষে তার মাথায় এক বুদ্ধি গজালো।

বাড়ি এসে এবার আর সে কেবল চালের পায়স তৈরী করলে না, একটি পাত্রে চালের সঙ্গে শুকনো খেজুর, বাদাম, কয়েকটি গাছের মিষ্টি মূল সিদ্ধ করলে। তাতে পায়সটার রঙ হলো কালো। জিনিসটা দেখলে আর খেতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু আসলে খাদ্যটা হলো আরও সুন্দর। সে নিজের এই কৌশলে মনে মনে খুব হাসলে। তার মনটা হয়ে গেল আগের চেয়ে খুব হাল্‌কা।

এবার মন্দিরে ঢুকতে তার কষ্ট হলো না। সহজেই ঢুকে চলতে চলতে তার শেষে এসে পড়লো। তারপর আগের আগুনের দেওয়ালটা নিরাপদে পার হয়ে গেল। আবার সে হাঁড়ির ঢাকনাটা খুলে তার ভেতরে যা রেখেছিল তা পরীক্ষা করে দেখলে। এবারও শুনতে পেলো সেই রকম অদ্ভুত হাসি।

এবারও তেমনি বিকৃত ভাঙা গলার স্বর শোনা গেল। তারা কথা বলতে লাগলো। তবে কথার মধ্যে প্রকাশ পেতে লাগলো কেমন একটা বিরক্তি ও ঘৃণা। কংফু বুঝলে, তার কৌশলটা চমৎকার খেটে গেচে। পিশাচগুলো বুঝতেই পারচে না, তার হাঁড়িতে রয়েচে কি। সে তাড়াতাড়ি ঢাকনাটা বন্ধ করে ছুটে চললো।

একটু পরেই সে দেখতে পেলো জায়গাটা দশ ভাগে ভাগ করা। প্রত্যেক ভাগে কত রকমের লোক বন্দী হয়ে আছে। তাদের নানা রকমের যন্ত্রণা দেওয়া হচ্চে।

যন্ত্রণায় তারা এমন চীৎকার করচে যে কংফুর কানে তালা লেগে গেল। সে খুব সাহসী ছিল বলে রক্ষা। না হলে কি যে হতো! সে সব দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। তিনটি ভয়ঙ্কর ঘর পার হয়ে সে চতুর্থ ঘরে গিয়ে পোঁছলো। সে দেখতে পেলো, ঘরখানার ঢোকবার দরজার ওপর পাথরের গায়ে আগুনের অক্ষরে লেখা রয়েচে—

"এই ঘরে অনশনের রাজত্ব।"

লেখা দেখে সে বুঝতে পারলে, সেই ঘরে তার মা আছেন। সে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। কেউ তাকে বাধা দিলে না। কারণ সে ভালো কাজ নিয়ে সেখানে এসেছিল। তাই তার কোন রকম বিপদ হলো না। ঘরে ঢুকে সে যা দেখলো তাতে তার বুকের রক্ত হিম হয় আর কি!

প্রকাণ্ড ঘর। তার মধ্যে পড়ে আছে শত শত লোক। সবাই না খেতে পেয়ে শুকিয়ে গেচে। তারা সবাই যন্ত্রণায় ছটফট করচে।

শেষে ঘরখানার একেবারে শেষ দিকে এক কোণে সে তার মাকে দেখতে পেলো। সে সেখান দিয়ে চলে যাচ্ছিল। তখন তিনি তাকে ক্ষীণস্বরে নাম ধরে ডাকলেন। তার ফলে সে তাঁকে চিনতে পারলো। না হলে তিনি এমন রোগা হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে দেখেও সে প্রথমটা চিনতে পারে নি। সে নিচু হয়ে তাঁর রোগা, শুকনো শরীরটির দিকে তাকিয়ে রইলো। বিশ্বাসই করতে পারছিল না তিনিই তার মা।

তাঁকে কোন কথা না বলে সে তাঁকে ধরে কোন রকমে তুলে বসিয়ে দিল। তারপর সঙ্গে যে চামচটি এনেছিল তাই দিয়ে একটু পায়স হাঁড়ি থেকে তুলে তাঁর মুখে দিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে এমন একটা চোখ-ধাঁধানো আলো তাঁদের দুজনের চোখে লাগলো যে, দুজনে খানিকক্ষণ কিছুই দেখতে পেলেন না। সেই সঙ্গে ঘরখানার মধ্যে ছুটে এলো একটা দমকা বাতাস।

একটু পরে যখন তাঁদের চোখের দৃষ্টি ফিরে এলো, তখন দেখলেন দুজনে তাঁদের নিজের বাড়িতে বসে আছেন।

ঘরে টেবিলের ওপর এক টুকরো চীনে কাগজ পড়ে ছিল। কংফু অবাক হয়ে গিয়েছিল। আরও অবাক হয়ে গেল সেই কাগজ দেখে। সে কাগজখানি তুলে নিতেই দেখলে, তাতে লেখা আছে, "তুমি মায়ের ভক্ত ছেলে। তাঁর জন্যে কষ্ট স্বীকার করেচো। সেইজন্যে তোমার মাকে তারতারাসের গহ্বর থেকে মুক্তি দেওয়া হলো।"

কংফু আর তার মা স্বাস্থ্য-জীবন ফিরে পেলেন। মায়ে-ছেলেয় হাত ধরাধরি করে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁদের মুক্তি দেওয়ার জন্যে দেবতাদের ধন্যবাদ দিতে লাগলেন।

[কংফুর মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত চীনে ছেলে-মেয়েদের দেখাবার জন্য বহুকাল থেকে চীনদেশে "মায়ের জন্যে পায়স উৎসব" হয়। কংফু যে রকম পায়স তৈরী করেছিল, অনেক চীনা সে রকম পায়স তৈরী করে খেয়ে থাকে।]

—শেষ—

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

গল্প-সপ্তক	...	১।০
পাঁচ শিকারী	...	১।০
সীমান্ত-পারে	...	১৷৵০
সিংহের থাবা	...	১৲
বন্দী কিশোর	...	১॥০
বাগ্‌দী ডাকাত	...	২৲
মেরু-অভিযান	...	১৲
মধুমতীর বাঁকে	...	১।০
ডাকাতের ডুলি	...	১।০
শয়তানের জাল	...	২৲
ভোম্বোল সর্দ্দার	...	১॥০
আলোকের দেশ	...	১।০
আফ্রিকার জঙ্গলে	...	১।০
সাইবিরিয়ার পথে	...	২৲
বিজ্ঞানী ও বীজাণু	...	৸৵০
ছোটদের বেতালের গল্প	...	৩৲